বকুল গন্ধে বন্যা এলো

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

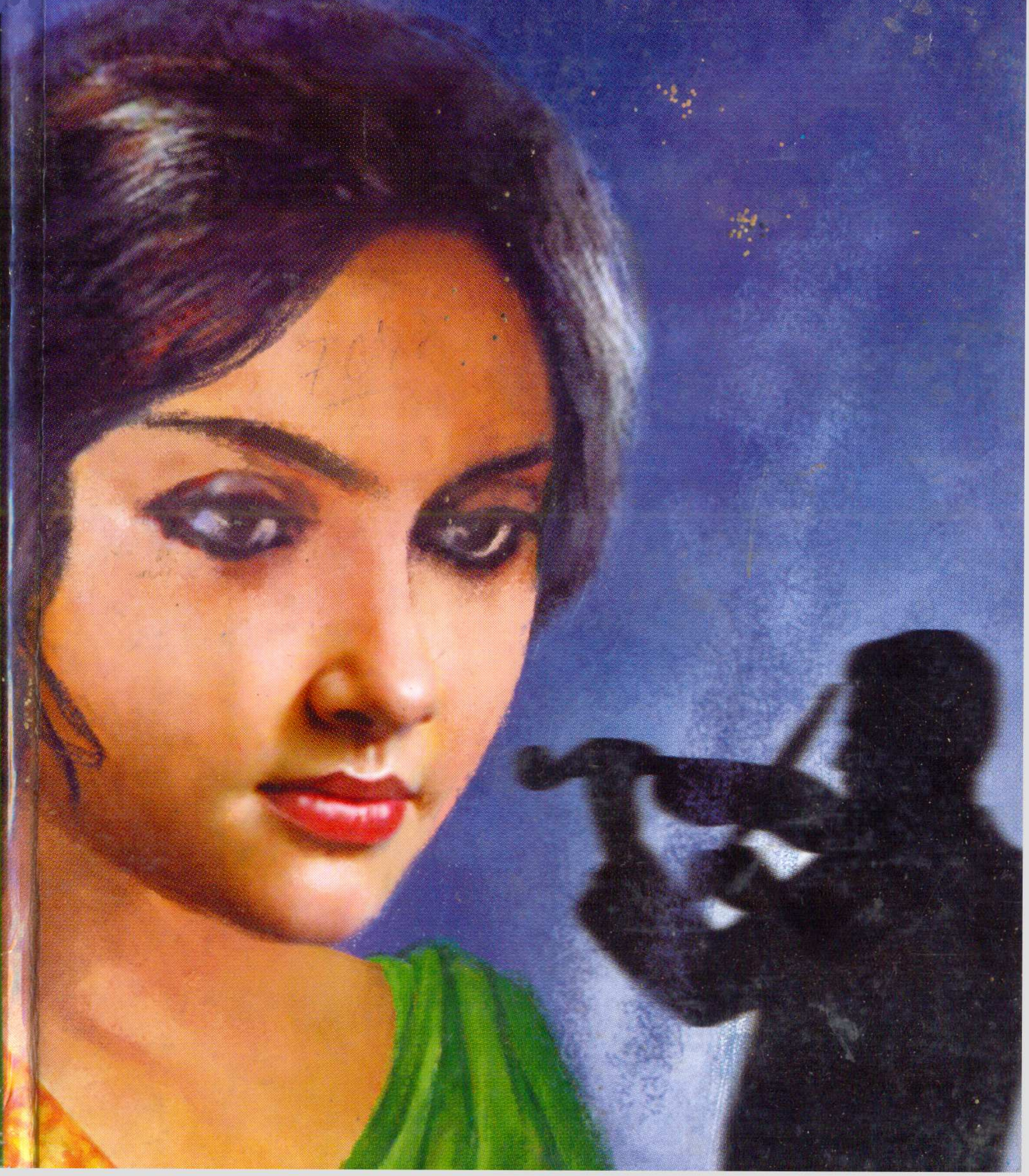

বকুল গন্ধে বন্যা এলো

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নাথ পাবলিশিং

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ▢ কলকাতা-৭০০০০৯

BAKUL GANDHE BANYA ELO
by
Niharranjan Gupta
Rs. 70.00
Published by
Samir Kumar Nath ❐ Nath Publishing
73 Mahatma Gandhi Road ❐ Kolkata-700 009

❐ এই গ্রন্থের রচনাকাল ❐
২৭শে বৈশাখ ❐ ৭ই আষাঢ় ❐ ১৩৬৫
প্রথম প্রকাশ ❐ শ্রাবণ ১৩৬৫

❐ প্রকাশক ❐
সমীরকুমার নাথ ❐ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❐ কলকাতা ৭০০০০৯

❐ প্রথম নাথ পাবলিশিং সংস্করণ ❐
নভেম্বর ২০০৭ ❐ অগ্রহায়ণ ১৪১৪

© নীলা মজুমদার

প্রচ্ছদ ❐ রঞ্জন দত্ত

❐ অক্ষরবিন্যাস ❐
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

❐ মুদ্রক ❐
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ISBN-81-8093-076-9

৭০ টাকা

সন্ন্যাসী বন্ধু অবধূতকে

প্রীতিমুগ্ধ ঃ ডাক্তার

বকুল গন্ধে বন্যা এলো

১

উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের মতই যেন ঘরময় ছড়িয়ে গেল হাসিটা।

আর ঠিক টানের মুখে হাতের বেহালার ছড়িটাও যেন আকস্মিকভাবে মাঝ পথে থেমে গেল পার্থর।

'কাফে দ্য মণিকো'র ডাইনিং হলে উপস্থিত নর-নারীর দলও সেই উচ্ছ্বসিত হাসির আকর্ষণে সেই দিকে বুঝি ক্ষণেকের জন্য তাকিয়েই আবার, যে যার সম্মুখোস্থিত টেবিলের ওপরে রক্ষিত আহার্য্য, পানীয় ও গল্প গুঞ্জনে মন দেয়।

থামেনি শুধু ঘরের কোনে ডায়াসের উপরে যন্ত্রসংগীতের ঐক্যতান।

যেমন বাজছিল তেমনি বেজে চলে।

কেবল থেমে গিয়েছিল পার্থর হাতের বেহালার সুর।

পার্থ তখনো নিষ্পলক চেয়ে আছে, ডাইনিং হলের দক্ষিণ কোণের টেবিলের চারপাশে যে দুটি তরুণীকে নিয়ে চার পাঁচটি সুবেশধারী অভিজাত চেহারার যুবক আহার্যে ব্যস্ত সেই দিকেই।

সহসা যেন পিওনো বাদক রবার্টের চাপা সতর্কবাণীতে চম্‌কে ওঠে পার্থ, হিস্‌,—পার্থ—হোয়াট আর ইউ লুকিং এ্যাট্‌। হোয়াই স্ট্যান্ডিং লাইক এ স্টাচু! ক্যারি অন। ক্যারি অন উইথ্‌ ইওর ভায়োলিন।

লজ্জিত, সপ্রতিভ পার্থ বন্ধু রবার্টের কথায় তাড়াতাড়ি আবার বেহালাটা কাঁধের ওপরে থুতনী দিয়ে চেপে ধরে, তাদের গায়ে ছড়ির টান দিয়ে, সুরে সুর মিলাবার চেষ্টা করে কিন্তু ঠিক যেন সুর মিলাতে পারে না।

নিজের অজ্ঞাতেই আবার পরমুহূর্তেই তৃষিত চোখের দৃষ্টি তার ঘুরে সেই ঘরের কোণে পতিত হয়।

খুব বেশি দূরে নয়।

মাত্র ডায়াস থেকে হাত ছয়ের ব্যবধান।

ডাইনিং হলের দুগ্ধধবল টিউব লাইটের প্রাচুর্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সুর্মা চিহ্নিত আঁখির তারায় কি এক স্বপ্নালসা দৃষ্টি যেন।

স্বপ্নালসা সেই মৃগনয়নে মধ্যে মধ্যে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে তরুণী।

শঙ্খধবল হাতের চম্পকসদৃশ শিথিল ভঙ্গির অঙ্গুলির সাহায্যে ধরা হয়েছে ছোট একটি রক্তাভ সুরাভর্তি সুদৃশ্য পেগ্‌ গ্লাস। অন্যান্য সঙ্গীরাও সুরাপানে ব্যস্ত।

টেবিলের ওপরে এখনো খানা পড়েনি। কেবল সুরার পাত্র।

পার্থ! হোয়াট দি হেল ইউ আর ডুইং! ...ক্যারি অন্ উইথ্ ইওর ভায়োলিন।

আবার রবার্ট ধমকে ওঠে পার্থপ্রতিমকে চাপা বিরক্তভরা কণ্ঠে। পার্থ আবার সচকিতে বেহালার তারে ছড়ি টানে।

কাফে দ্য মণিকো।

কলকাতা শহরের একটি অভিজাত, রুচিসম্পন্ন, ধনী ও বিলাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত, হোটেল, পান ও ভোজনশালা।

তারই প্রশস্ত ডাইনিং হল।

রাত বোধকরি সোয়া দশটা হবে।

অভিজাত সম্প্রদায়ের সুবেশধারী নানা বয়সী নরনারীতে ডাইনিং হলটি গমগম করছে তখন।

টুং টাং ছুরি কাঁটা চামচ-এর মৃদুমন্দ আওয়াজ।

সংগীতের টুক্‌রো টুক্‌রো শব্দ বুঝি।

আর সেই সঙ্গে যেন গুণগুনিয়ে চলেছে অনেক চাপা কণ্ঠের হাসি গল্পর গুঞ্জনটা।

হোটেলের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

ওদিকে একটানা কিছুক্ষণ অর্কেস্ট্রা বেজে বিরতি হয়েছে।

পার্থ এবার নিশ্চিন্ত হয়েই যেন ডাইনিং হলের দক্ষিণ দিকে আবার দৃষ্টিপাত করলো।

বাইশ তেইশ বৎসরের বেশী হবে না তরুণীটির বয়েস।

পরিধানে দামী ইষৎ নীলাভ সূক্ষ্ম নাইলনের শাড়ী। গায়ে ঊর্ধহাতা অনুরূপ একটি ব্লাউজ।

ঘরের দুগ্ধধবল অত্যুজ্জ্বল টিউব আলোয় অতীব সেই সূক্ষ্ম ও পাতলা জামা ও শাড়ী ভেদ করে তরুণীর অপূর্ব দেহ সুষমাকে যেন প্রকটিত করে তুলেছে।

গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হলেও প্রসাধন সাহায্যে চক্ষুর দৃষ্টিকে যেন ধাঁধিয়ে দেয়।

মুখখানির যেন সত্যিই তুলনা হয় না।

সুচারু ছোট অর্ধচন্দ্রের মত কপালের দু'পাশে মাথার শ্যাম্পু করা চুলের স্থানচ্যুত কয়েকগাছি এসে পড়েছে।

টানা বঙ্কিম দু'টি ভ্রুর মধ্যস্থলে ছোট একটি কুঙ্কুমের টিপ।

মদালসা বিহ্বল দুটি গভীর আঁখিপক্ষে অর্ধাবৃত্ত মৃগনয়ন।

সুন্দর নাসা।

লিপস্টিক্ রঞ্জিত রক্তাভ দুটি চিকন ওষ্ঠ সামান্য দ্বিধাবিভক্ত করে প্রকাশ পাচ্ছে সুগঠিত মুক্তাসদৃশ দন্তপংক্তি।

শ্যাম্পু করা চুল ডোনেট্ করা।

মধ্যে মধ্যে হস্তধৃত পেগ গ্লাসটি ওষ্ঠ প্রান্তে ধরে চুমুক দিচ্ছে তরুণী।

আবার অর্কেষ্ট্রা শুরু হলো।

পার্থ বেহালাটা তুলে নিল কাঁধের ওপরে।

আরো আধঘন্টা পরে।

রাত প্রায় সোয়া এগারটা।

অর্কেষ্ট্রা থেমে গিয়েছে। বাজিয়েরা সব ভিতরে কখন চলে গিয়েছে। বাড়ি ফিরবার জন্য সে রাত্রের মতো ডাইনিং হলের দরজা পথে এগুতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো পার্থ, মৃদু একটা সংগীতের গুঞ্জন কানে যেতেই।

বকুল গন্ধে বন্যা এলো।

যারা আহার্য্য ও পানীয়ের লোভে এসে ভিড় করছিল ডাইনিং হলে সে রাত্রে কেউ আর নেই সবাই কখন চলে গিয়েছে। ভৃত্যের দল সব টেবিল পরিষ্কার করছে।

আর—

সেই কোণের টেবিলটার সামনে কেবল তখনো দুটি চেয়ারে বসে আছে সেই তরুণী ও দলের একজন মাত্র যুবক।

টেবিলের ওপরে রক্ষিত তখনো তাদের কাঁচ পাত্র।

দুজনাই যে তারা অত্যধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে এবং সেই জন্যই তাদের দুজনার কারোই যে উঠে চলে যাবার শক্তিটুকু পর্যন্তও নেই, বুঝতে কষ্ট হয় না পার্থর।

হোটেলের গোয়ানিজ ম্যানেজার ডি'সুজা এগিয়ে গিয়ে ওদের টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

স্যার! হোটেল উইল বি ক্লোজড্ নাও।

ডি'সুজার কণ্ঠস্বরে তরুণী তার মদির বিহ্বল দৃষ্টি তুলে তাকালো বারেকের জন্য তার দিকে।

ডি'সুজা আবার তার বক্তব্য বলে গেল।

ও সিওর! উই মাস্ট রিটায়ার নাও মনীষ! গেট্ আপ্—বলে রীতিমতো

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো তরুণী এবং এগুতে গিয়েই পড়ে যাচ্ছিল দেখে, তাড়াতাড়ি ডি'সুজা সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে বলে, কুড্ আই হেল্প ইউ—

তরুণী আবার বিলোল দৃষ্টিতে তাকালো।

হেল্প! নো—নো নিড্!।

সঙ্গের যুবক মনীষও ততক্ষণ নেশার ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে টলতে টলতে।

সে বলে, হোয়ার অল দি ডেভিলস্ গন মিতা—

টু দি হেভেন অর হেল—

মৃদু হেসে মিতা জবাব দেয় মদির কণ্ঠে।

টলতে টলতেই দুজনে দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

খুব কাছাকাছি একেবারে হাত দুয়েকের ব্যবধানে।

তরুণীর দিকেই তাকিয়ে এতক্ষণে অপলক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়েছিল পার্থ। এতক্ষণে, এতক্ষণে পার্থ চিনতে পারে তরুণীকে।

মিতা রায়।

রূপালী পর্দার সর্বাপেক্ষা গ্ল্যামার গার্ল।

জনচিত্তবিমোহিনী অভিনেত্রী—মিতা রায়।

বর্তমানে পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিশ্রমিকের কমে যে কোন কনট্রাক্টই সই করছে না কোন ছবিতে নাকি।

বাইরে যাবার প্রশস্ত কাচের দরজার বরাবর এসে মিতা রায় আবার টলে পড়ে যাচ্ছিল।

এবার নিজের অজ্ঞাতেই পার্থ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে।

থ্যাঙ্কস্!

তীব্র অ্যালকহলের কটুগন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট কথাটি উচ্চারিত হয় মিতা রায়ের মুখ থেকে।

সুড্ আই হেল্প ইউ! বলে পার্থ।

ইফ্ ইউ প্লিজ।

হোটেলের দরজার পেভমেন্টের সামনেই পার্কিংয়ে একটি ছোট ও একটি বিরাট ফোর্ড কনসাল ও প্লিমাউথ গাড়ি পার্ক করা ছিল।

সঙ্গের যুবক মনীষ ছোট গাড়িটায় গিয়ে উঠে বসতেই গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়ির জানালা পথে শূন্য হাতটি দুলিয়ে মনীষ একবার বললে, টা,টা—

মিতা রায়ের গাড়িতে কিন্তু কোন ড্রাইভার ছিল না। ছিল একটি বাচ্চা নেপালী সফার।

সেই তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

পার্থের সাহায্যেই মিতা রায় কোনমতে সামনের ড্রাইভিং সীটে গিয়ে উঠে বসে ফিরে তাকালো পার্থর দিকে।

হাউ ফার ইউ উড্ বি গোয়িং?

মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় পার্থ, কালীঘাট।

কাম এলং, আই উইল গিভ্ ইউ এ লিফট্—মিতা বললে।

না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। আমি ট্রাম না পেলেও বাস পেয়ে যাবো। কিন্তু আপনি কি ড্রাইভ করতে পারবেন?

ড্যাস বোর্ডের সবুজ আলোটা সুইচ্ অন্ করার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠেছিল। সেই সবুজ আলোর দ্যুতিই মিতা রায়ের চোখে মুখে এসে পড়েছিল।

সেই আলোতেই পার্থ দেখলে, মিতা রায়ের ওষ্ঠ প্রান্তে মৃদু হাসির অস্পষ্ট ইংগীত।

ডোণ্ট্ ওরি—কাম এলং।

গাড়ির ওপাশের দরজাটা খুলে দিল মিতা রায়।

এবারে নিজের অজ্ঞাতেই যেন পার্থ পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো মিতা রায়ের পাশেই ফ্রণ্ট্ সীটে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি এবারে ছেড়ে দিল মিতা রায়।

প্রায় নির্জন মেটাল বাঁধানো মধ্যরাত্রের রাস্তা।

দামী গাড়ি ত্রিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে।

গাড়ির খোলা জানালা পথে হাওয়ার সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ মেশামিশি হয়ে পার্থর ঘ্রানেন্দ্রিয়কে যেন মাতাল করে তোলে।

কিন্তু আশ্চর্য সাবধানতার সঙ্গে স্টীয়ারিং ধরে গাড়ি ড্রাইভ করছে মিতা রায়।

ব্যবহারে কোন মাদকতা, কোন শৈথিল্যই নেই যেন।

পথের দুপাশে একচক্ষু বিদ্যুৎবাতিগুলো গাড়ির গতিবেগের মুখে একের পর এক পিছিয়ে পড়ছে।

আপনি কালীঘাটে থাকেন?

সহসা মিতা রায়ের প্রশ্নে যেন চম্‌কে ওঠে পার্থ।

মৃদু কণ্ঠে বলে, হুঁ।

কি নাম আপনার?

পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

রিয়েলি! এ ড্রিমি সুইট্ নেম নো ডাউট।

তারপর আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

পাশ দিয়ে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে একটা ট্যাক্সী ছুটে বের হয়ে গেল উল্টো মুখে।

আবার প্রশ্ন, আপনিও বুঝি ডিনার খেতে গিয়েছিলেন?

না, আমি ওখানে অর্কেস্ট্রায় ভায়োলিন বাজাই।

ভায়োলিন! আই সি—

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

শুধু ঐ ভায়োলিনই বাজান না আরো কিছু করেন।

না, ঐ ভায়োলিনই বাজাই শুধু!

আপনি বিরক্ত হচ্ছেন নাতো ?

না, না—

আবার কিছু সময় স্তব্ধতা, শুধু ইঞ্জিনের একটানা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

চরকডাঙায় মোড় বরাবর এসে আবার মিতা রায় প্রশ্ন করে, বাড়িতে আপনার কে কে আছেন পার্থ বাবু?

আমি আর আমার মা।

বৌ নেই তাহলে?

না, বিয়েতো করিনি!

লাকি গাই! এণ্ট মোষ্ট ইনটেলিজেণ্ট—কোন দিকে যাবো বলুন?

এখানে নামিয়ে দিলেই আমি চলে যেতে পারবো।

তা পারবেন জানি, কিন্তু আমারও তো কৃতজ্ঞতা বলে একটা বোধ আছে।

কৃতজ্ঞতা!

নিশ্চয়ই। আপনি আজ হোটেল থেকে বেরুবার সময় না সাহায্য করলে বিশ্রী একটা সিন্ ক্রিয়েট হতো না কি! মৃদু হেসে মিতা রায় কথাগুলো বলে তাকালো পার্থর মুখের দিকে।

পার্থ কোন জবাব দেয় না, চুপ করেই থাকে।

মিতা আবার বলে, ছিঃ ছিঃ ভাবতেও আমার লজ্জা করছে—

কিছু মনে করবেন না মিতা দেবী, একটা কথা বলবো—

কি! মদ খাই কেন এইতো! কথাটা আমার জীবনে অত্যন্ত পুরানো হয়ে গিয়েছে মিঃ চৌধুরী। তবে এটা ঠিক, আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, আজকের ব্যাপারটার জন্য মনীষ আর রঞ্জনই দায়ী। মনীষের ঘরে হঠাৎ বোতল ফুরিয়ে গেল তখন ওরা বললে ওখানে যাবার জন্য। আমার কিন্তু ইচ্ছা ছিল না।

তবে গেলেন কেন?

গেলাম কেন! তাই না?—বলেই হঠাৎ চম্‌কে ওঠে মিতা, কিন্তু একি এযে বরাবর ব্রিজের কাছে চলে এলাম!

এখানেই আমি নামবো।

কিন্তু আপনার বাড়ি—

গাড়ি ততক্ষণ থামিয়ে দিয়েছে মিতা।

ঐ যে সামনে ঐ গলিটা দেখা যাচ্ছে ঐ গলির মধ্যে।

কিন্তু পার্থ গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই মিতাও নামে।

চলুন আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি

না, না—তার আর প্রয়োজন হবে না।

তা কি হয় চলুন।

সত্যি খুব কাছেই পার্থর বাড়ি।

গলিতে ঢুকে দুখানা বাড়ির পরেই তৃতীয় বাড়িখানা।

পার্থই বন্ধ দরজার কড়া ধীরে নাড়া দিল। এবং বার দুই কড়া ধরে নাড়া দিতেই বন্ধ দরজা খুলে গেল ও একটা আলো জ্বলে উঠলো।

সামনেই দাঁড়িয়ে খোলা দরজার ওপরে বাইশ তেইশ বৎসরের একটি তরুণী। সাধারণ একটি মিলের শাড়ী পরিধানে।

হাতে একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি।

ভিতরের আলোর খানিকটা সামনের রাস্তায় এসে পড়েছিল।

সেই আলোতেই পার্থর পাশে দণ্ডায়মান অপরূপ সজ্জায় সজ্জিতা মিতাকে দেখে তরুণী যেন সহসা থম্‌কে দাঁড়ায়।

আচ্ছা আমি তাহলে আসি পার্থবাবু। নমস্কার।

মিতার কথায় চম্‌কে ফিরে তাকায় পার্থ তার দিকে। এবং সে কিছু বলার আগেই মিতা পিছন ফিরে চলতে শুরু করে।

মিতার পায়ের ফ্ল্যাট্ হিল সু-চপ্পলটার শব্দ ধীরে ধীরে গলির মোড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

২

তুমি এখনো জেগে ছিলে অনু?

পার্থর প্রশ্নর জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করে অনীতা, এত রাত হলো যে আজ ফিরতে আপনার পার্থ বাবু!

রাত! হ্যাঁ, একটু রাত হয়ে গেল।

একই বাড়িতে আজ বছর পাঁচেক হলো আছে ওরা।

পার্থ তার মাকে নিয়ে বাড়ির দোতলার আড়াইখানা ঘর নিয়ে থাকে আর নিচের দুখানা ঘর নিয়ে থাকে অনীতা, তার বৃদ্ধ দাদু অবিনাশ ঘোষাল ও অনীতার আরো ছোট তিনটি বোন।

সংসার অনীতাই চালায় তার আয়ে।

বি. এ পাশ করে কোন এক স্কুলে টীচারি করে অনীতা।

রোগা, কালো, দেখতে অত্যন্ত সাদাসিধে অনীতার চেহারা।

ইদানীং চাকুরির সুবিধার জন্য অনীতা, বি. টি. পড়ছে।

মাস দুইয়েকের মধ্যেই পরীক্ষা।

অনেক রাত অবধি জেগে তাই সে পড়াশুনা করে।

আজো একাকী ঘরের এক কোণে টেবিল ল্যাম্পটি জ্বেলে অনীতা বসে বসে পড়ছিল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই নিঃশব্দে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিল পার্থকে।

রাত সাড়ে এগারটার আগে কোনোদিনই পার্থ বড় একটা ফেরে না। আজ একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল।

রাত বারটা।

নিচে থাকে বলে বরাবরই অনীতাই পার্থকে রাত্রে দরজা খুলে দেয়। আগে আগে অবিশ্যি পার্থর মা-ই এসে রাত্রে দরজা খুলে দিতেন কিন্তু অনীতাই একদিন বলেছিল, আপনি কেন নিচে যান মাসীমা, আমিই তো রাত জেগে নিচে পড়ি, দরজা আমিই খুলে দেবো এবার থেকে।

পার্থর মা মৃন্ময়ী অনীতার প্রস্তাবটা সানন্দেই মেনে নিয়েছিলেন কারণ একে বাতের রোগী, সিঁড়ি দিয়ে বারবার ওঠা নামা করতে বেশ কষ্টই হয় তাছাড়া

প্রথম রাত্রেই ঐ সময়টা যা একটু ঘুম হয়। ঘুমটা ভেঙ্গে গেলে ঐ সময় আর রাত্রে যেন কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না।

বাকী রাতটুকু জেগেই কেটে যায়।

তাই অনীতা যখন নিজে থেকেই বলেছিল, আমিই দরজাটা খুলে দেবো। আপনাকে উঠ্‌তে হবে না।

মৃন্ময়ী মৃদু কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, তাই দিও মা।

গত কয়েকমাস ধরে সেই ভাবেই চলে আসছিল।

পার্থ এসে দরজার কড়া নাড়লে অনীতাই গিয়ে দরজা খুলে দিত।

অনীতা মুখে বলেছিল বটে অনেক রাত জেগে সে পড়াশুনা করে, রাত্রে পার্থকে দরজা খুলে দিতে কোন অসুবিধাই নেই।

কিন্তু সেই অনেক রাতের জাগরণটা যেন তার পার্থ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যেতো। পার্থর পদশব্দটা উপরে উঠবার সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দু' চোখ ভরে তার ঘুম নেমে আসতো।

সারাটা দিনের গুরু পরিশ্রমের ক্লান্তিটা যেন তার বিশেষ ঐ মুহূর্তটি পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে একেবারে শয্যার ওপরে এলিয়ে দিতো।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে অন্ধকারে শয্যার এক কোণে পরিচিত উপাধানটির ওপর মাথাটা রেখে চোখ বুজতো অনীতা।

সে রাত্রেও পার্থর পদশব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যাবার পর অনীতা ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শয্যায় এসে গা এলিয়ে দিল।

কিন্তু অন্যান্য রাত্রের মতো সঙ্গে সঙ্গেই দু চোখের পাতায় ঘুম আসে না।

গলির গ্যাসের আলোয় দরজার অনতিদূরে ক্ষণপূর্বের দেখা সেই অপূর্বসুন্দর নারী মুখখানি থেকে থেকে অনীতার বোজা চোখের সমস্ত অন্ধকার দৃষ্টিটা জুড়ে যেন কেবলই ভেসে উঠতে লাগলো।

ঘুম যেন ক্লান্ত দু'চোখের পাতা থেকে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

এত রাত্রে কে এসেছিল ঐ নারী, পার্থকে তার বাড়ির দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। এর পূর্বে তো কখনো অনীতা ওকে দেখেনি।

গলির গ্যাসের আলোয় ক্ষণেকের জন্য দেখলেও অনীতা বুঝতে পেরেছিল অনিন্দ্যসুন্দর অপূর্ব সেই নারীমূর্তি।

কিন্তু কে! কে সে!

সহসা মধ্যরাত্রির সেই স্তব্ধতা যেন করুণ একটি সুরের মূর্চ্ছনায় সাড়া দিয়ে ওঠে।

আশ্চর্য!

এত রাত্রে পার্থ বেহালা বাজাচ্ছে!

কখনো ত এমন হয় না।

ফিরে আসবার পর রাত্রে কখনো তো আর সাড়া পাওয়া যায় না পার্থর।

অন্ধকারেই ধীরে ধীরে এক সময় অনীতা শয্যার উপর উঠে বসলো। পাশেই ছোট বোন নমিতা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘুমন্ত তার শ্বাস প্রশ্বাসের একটানা শব্দটা অন্ধকারে মৃদু অথচ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

মাথার চুল খুলে গিয়েছিল।

আলগোছে শিথিল হাতে চুলটা জড়িয়ে নিল অনীতা।

নিঃশব্দেই শয্যা থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে এলো।

এবারে আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বেহালার সুর। ধারণা তার মিথ্যা নয়। পার্থই উপরে বেহালা বাজাচ্ছে।

সিঁড়ির ধাপগুলো একটার পর একটা অতিক্রম করে অনীতা উপরের সরু অপ্রশস্ত বারান্দাটায় এসে দাঁড়ালো।

মধ্যরাত্রির ক্ষীণ চাঁদের আলো বারান্দায় এসে লুটিয়ে পড়েছে।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, এসময় এত রাত্রে উপরে আসাটা উচিত কি অনুচিত তাও যেন একটিবার মনে হয় না অনীতার।

পার্থ ও তার মার সঙ্গে অনীতার তো কোন আত্মীয়তাই নেই। সামান্য পরিচয় মাত্র।

তাও একই বাড়িতে গত বছর দেড়েক ধরে উপরে ও নিচের তলায় থাকার দরুশ যেটুকু আলাপ পরিচয় বা হৃদ্যতা হয়েছে পরস্পরের মধ্যে।

হঠাৎ যদি পার্থর চোখে পড়ে যায় সে। আর সে যদি জিজ্ঞাসা করে, এত রাত্রে কি জন্য উপরে এলে অনীতা।

কি জবাব দেবে সে।

সহসা একটা দুনির্বার লজ্জা যেন অনীতার পা দুটো টেনে ধরে।

তাড়াতাড়ি ফিরতে গিয়ে মৃদু চাঁদের আলোয় একটা দৃশ্য তার চোখে পড়ে।

বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তে রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পার্থ বেহালা বাজাচ্ছে।

ফিরে দাঁড়িয়েও যেন পা বাড়াতে পারে না অনীতা।

পার্থর কিন্তু কোন দিকেই খেয়াল নেই। আপন মনে সে বেহালা বাজিয়ে চলেছে।

রাত্রে কচিৎ কখনো বেহালা বাজায় পার্থ।

এবং বাজায় সে তার ঘরে বসেই।

কখনো এমনি করে আজকের রাতের মত ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়ে তো কই অনীতা তাকে বেহালা বাজাতে শোনেনি।

কতক্ষণ অমনি করে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনীতা পার্থর বেহালা বাজানো শুনেছিল মনে নেই।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি যেন পালিয়ে নিচে চলে এসেছিল।

এবং এসেই সোজা একেবারে নিজের শয্যার ওপরে শুয়ে অন্ধকারে চোখ বুজেছিল।

আর সেই রাত্রেই প্রথম অনীতা বুঝতে পেরেছিল, গত দেড় বৎসরে কখন এক সময় তিল তিল করে পার্থকে ঘিরে তার বুকের মধ্যে ভালবাসার মধু সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারেই লজ্জায় যেন অনীতা নিজেকে শয্যার ভিতরে লীন করে দিতে চায়। প্রথমটায় এসেছিল লজ্জা তারপরই অন্ধকারে দুটি মুদ্রিত চক্ষুর কোল বেয়ে নেমে আসে অশ্রুর ধারা।

কেঁদে কেঁদেই সে রাত্রে বুঝি এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল অনীতা।

বালীগঞ্জ সারকুলার রোডে প্রায় চোদ্দ কাঠার উপরে বাংলো প্যাটার্ণের বাগান বাড়িটার গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে একেবারে পোর্টিকোর নিচে এসে গাড়ি থামাল মিতা।

নেপালী আয়া কাঞ্চী ইতিমধ্যে গাড়ির শব্দ পেয়ে নিচে এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। আঠারো উনিশ বছরের ভরন্ত যৌবন, হাসি খুশি পাহাড়ী মেয়েটি।

এত রাত করলি মেমসাহেব! কাঞ্চী এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে।

কেন তোর ঘুম পেয়েছে বুঝি খুব কাঞ্চী।

না। কিন্তু এত রাত হলো কেন তোর আজ?

বাথরুমে স্নানের জল দে কাঞ্চী!

এত রাত্রে স্নান করবি মেম সাহেব!

মিতা কাঞ্চীর শেষের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় তাঁর নিজের শয়ন ঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল।

ব্লু রংয়ের ভারী দামী পর্দাটা তুলে মিতা রায় তার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো।

ঘরের চারিদিকে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য যেন ছড়িয়ে রয়েছে।

মেঝেতে পুরু দামী ইজীপশিয়ান কার্পেট। একধারে ডানলো-পিলোর নিভাজ শয্যা।

তারপাশে বর্মাটিকের কারুকার্য করা প্রমাণ আর্শী লাগানো বিরাট আলমারী। ঘরের মধ্যস্থানে সুদৃশ্য সোফা সেটি।

একটা সোফার ওপরে এসে গা এলিয়ে বসে পড়লো মিতা রায়।

আধুনিক চিত্র জগতের সর্বাপেক্ষা গ্ল্যামার গার্ল মিতা রায়।

শুধু যৌবন আর রূপই নয়, অভিনয়কলাতেও অসাধারণ নৈপুণ্য।

প্রথম কন্ট্রাক্ট্ মাসে পাঁচশত টাকা থেকে আজ তাই মাত্র পাঁচ বৎসরে চিত্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর আসনটি সে দখল করে নিয়েছে।

চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের নিচে সে আজ আর কোন ছবিতে কন্ট্রাক্ট্ করে না।

চিত্রমোদীরা, জনসাধারণ আজ মিতা রায় বলতে পাগল।

সবার মুখেই কেবল একটি নাম।

মিতা, মিতা, মিতা! মিতা রায়।

কাগজে কাগজে তার অসংখ্য ভঙ্গীর অসংখ্য ছবি।

কখন সে কোথায় যায় প্রেস ফটোগ্রাফারের দল যেন মুখিয়ে আছে।

ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্—অমনি ফটো উঠে যাচ্ছে।

নেশাটা ঝিমিয়ে আসছিল।

সহসা পাশেই ত্রিপয়ের ওপরে ফোনটা বেজে উঠলো, ক্রিং ক্রিং ক্রিং....।

অলস শিথিল ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে মিতা রায় ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো।

কে, মিতা!

হুঁ! কে স্যাণ্টি?

ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠে জবাব এলো, হ্যাঁ, কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলতো মিতা?

কিন্তু তোমারই বা ব্যাপার কি এত রাত্রে!

এত রাত্রে মানে!

ঘরে ঘড়ি থাকলে চেয়ে দেখো!

মাত্র তো পৌনে একটা!

পৌনে একটা কি সন্ধ্যা?

তা নয়, তবে সেই সন্ধ্যা থেকে এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

একটু বেরিয়েছিলাম।

স্যান্টি বোস অর্থাৎ সনত বোস।

বর্তমান অভিজাত সোসাইটির অন্যতম খেয়ালী ধনীপুত্র।

কিছুকাল আগে বাপের মৃত্যু হয়েছে।

এবং বাপের মৃত্যুতে বিরাট সম্পত্তি এসেছে সনতের হাতে। গাড়ি বাড়ি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ও বিজনেস নিয়ে প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি। বাইরের টান সনতের চিরদিনই ছিল, তবে বাপ যতদিন বেঁচেছিল খানিকটা চোখের পর্দা ছিল। তারপর বাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটা গিয়েছে উড়ে।

তাই সনৎকুমার আজ সিনেমা অভিনেত্রীদের মহলে স্যান্টি নামে হয়েছে পরিচিত।

প্রতি মাসে নতুন নতুন গাড়ি।

প্লিমাউথ, ষ্টুডি কমাণ্ডার, প্রিসিডেণ্ট, বুইক, মাষ্টার বুইক। প্যাণ্টের ব্যাক্ পকেটে সর্বদাই একশত টাকার নোটের তাড়া।

হাঁটা চলা কথাবার্তা চাউনি হাসি, সব কিছুতেই একটা প্রিন্সের ষ্টাইল যেন।

কিন্তু এত রাত্রে কোথা থেকে ফোন করছো! মিতা আবার প্রশ্ন করে।

কেন, বাড়ি থেকে।

নিশ্চয়ই শোবার ঘর থেকে নয়।

হলেই বা ক্ষতি কি!

ঘরে বৌ নেই বুঝি!

আছে। তবে আজকাল তো সে নিচের তলাতেই শোয়।

তাই নাকি। আহা বেচারী!

ঠাট্টা করছো!

না, ঠাট্টা নয়। কিন্তু আমার ভীষণ ঘুম আসছে। সো গুড্ নাইট!

দ্বিতীয় আর প্রশ্নের অবকাশ না দিয়েই মিতা রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো।

৩

কিন্তু অত রাত্রে স্নান করে শয্যায় শুয়েও ঘুম আসে না মিতার চোখে।

ঘুরে ফিরে একটি মুখই কেবল মনে পড়ে।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী!

চমৎকার কবিত্ব ভরা নামটি।

আচ্ছা হঠাৎ সে পার্থকে লিফট্-ই বা তার বাড়ি পর্যন্ত দিতে গেল কেন?

কোথায় কোন রেস্তোরাঁ হোটেলে অর্কেস্ট্রাতে ভায়োলিন বাজায় লোকটা।

কি-ই বা পরিচয় তার।

কিন্তু চিনতে পেরেছে কি মিতাকে সে!

নিশ্চয়ই পেরেছে।

আজ মিতাকে চেনে না কে!

পাবলিসিটির দৌলতে আজ তাকে চিনতে কারই বা কষ্ট হতে পারে।

গত দু সপ্তাহ ধরে তার আগামী ছবি 'রাত হলো অনেক'এর বিচিত্র রঙিন সব পোষ্টারে পোষ্টারে সারা কলকাতা শহরটাই তো ছেয়ে গিয়েছে।

তবে পার্থই বা তাকে চিনতে পারবে না কেন!

নিশ্চয়ই পেরেছে।

এখন কি করছে ভদ্রলোক!

নিশ্চয়ই ঘুম নেই চোখে। মনে মনে তার মুখখানাই ভাবছে।

ভারী হাসি পায় হঠাৎ মিতা রায়ের।

বেচারী পার্থপ্রতিম চৌধুরী।

কিন্তু সে নিজেই বা এখনো ভুলতে পারছে না কেন সেই মুখটা।

কেনই বা এই বিনিদ্র রজনীর নিঃসঙ্গ স্তব্ধ মুহূর্তে থেকে থেকে সেই মুখখানাই মনে করবার চেষ্টা করছে বার বার।

কেন, কেন—

গাড়ি চালাতে চালাতে নেশা ভরা চোখে প্রথম গাড়ির ড্যাস বোর্ডের আলোয়, পার্শ্বে উপবিষ্ট পার্থর মুখের দিকে তাকালেও মিতা যেন সহসাই কেমন চম্‌কে উঠেছিল।

অনেক, অনেক দিনকার একটা হারানো অস্পষ্ট মুখ যেন আশ্চর্য ভাবেই ঐ পার্শ্বে উপবিষ্ট পার্থর মুখের ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। তবু কিন্তু ভাল করে তাকাতে পারেনি মিতা পার্থর মুখের দিকে সে সময়। নেশার টানে চোখের পাতা দুটো যেন ভারী হয়ে নিচের দিকে ঝুলে আসছিল। অন্ধকারে সেই মুখটাই নতুন করে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে মনের পাতায় এখন।

অস্পষ্ট ঝাপসা।

অথচ চেনা চেনা!

আবার আপন মনেই হেসে ফেলে মিতা।

সে পাগল হয়ে গেল নাকি!

একটা আধটা বছর তো নয়। মনে মনে গণনা করে দেখে মিতা, দীর্ঘ নয় বছর ইতিমধ্যে কখন মিতার জীবনে তারপর পার হয়ে গিয়েছে।

নয়টা বছর।

তখন সে মিতা রায় নয়, মিনতি—

মার মুখের দিকে চেয়ে মিনতির সেদিন কোনরকম প্রশ্ন করতে সাহসই হয়নি।

গভীর রাত্রে মার সঙ্গে বের হয়ে, দীর্ঘ দু'মাইল মেঠোপথ ভেঙে এসে, মধ্যরাত্রির কলকাতাগামী ট্রেন ভেবে উল্টোমুখী ট্রেনটায় তাড়াহুড়াতে তারা উঠে পড়েছিল।

আর একটু হলেই ট্রেনটা তারা ফেল করেছিল আর কি।

স্টেশনে পৌঁছে দেখে ট্রেনটা এসে গিয়েছে। কোনমতে ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠেছিল মিনতি মার হাত ধরে।

সামনেই কি একটা যোগের স্নান। কি প্রচণ্ড ভিড়ই না ছিল সেদিন গাড়িতে।

ঠিক উল্টোমুখী ট্রেনে যে তারা উঠেছে ভুলটা ভাঙতে কিন্তু বেশী দেরি হয়নি।

যাত্রীদের কথাবার্তা শুনেই তারা বুঝতে পেরেছিল কলকাতার ট্রেনে না উঠে তারা পশ্চিমের ট্রেনে উঠে বসেছে।

গাড়ির মধ্যে গাদাগাদি করে যাত্রীরা চলেছে সব প্রয়াগে কুম্ভস্নানে।

বছর নয় বয়স তখন মাত্র মিনতির।

রোগা ডিগডিগে চেহারা। পরিধানে সাধারণ একটা জামা আর শাড়ী। গায়ে একটা ছেঁড়া আলোয়ান।

শীতের রাত।

গাড়ির খোলা জানালা পথে ঠাণ্ডা হিমকণাবাহী মাঘের হাওয়া আসছে।

সে কি কাঁপুনি।

দুহাতে মাকে জড়িয়ে একপাশে কোনমতে দাঁড়িয়েছিল সেদিন-কার সেই গেঁয়ো মেয়ে মিনতি।

শীত করছে মিনু?

হ্যাঁ মা!

কিন্তু তাড়াতাড়ি যে ভুল ট্রেনে উঠে বসলাম, এখন কি করি বলতো?

এতক্ষণে কোনমতে সাহস সঞ্চয় করে ভীরু কণ্ঠে মাকে প্রশ্ন করে মিনতি, কোথায় যাচ্ছি মা আমরা?

ভেবেছিলাম তো হুগলীতে তোর মামার ওখানেই যাবো। কিন্তু এ ট্রেন যে পশ্চিম যাচ্ছে—

তাহলে এখন কি হবে মা!

উঠেই যখন পড়েছি প্রয়াগেই এখন যাবো। প্রয়াগে স্নান করে তারপর হুগলী যাবো।

মা মলিনা তখন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছে।

মামার বাড়িতেই কি এবার থেকে আমরা থাকবো মা? ভীরু কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে মিনতি।

হ্যাঁ, আর ওখানে নয়।

মার কথায় বালিকা মিনতি যেন স্বস্তি বোধ করে অনেকখানি।

যে বাড়ি ছেড়ে এই মধ্যরাত্রে তারা একটু আগে চলে এসেছে সেই বাড়িতে আর তারা ফিরবে না শুনে মিনতি সত্যিই যেন স্বস্তি বোধ করে।

বাড়ি তো নয় যেন একটা কয়েদখানা।

দিবারাত্রি খালি কথায় কথায় শাসন-বকুনী প্রহার আর অনাহার।

সর্বদা সংকোচ আর ভয়ে ভয়ে আত্মগোপন করে থাকা।

মিথ্যে নয়।

মিনতির যখন মাত্র তিন বৎসর বয়স সেই সময় মলিনার স্বামী কলকাতায় মটোর চাপা পড়ে অ্যাকসিডেন্টে মারা যান।

এবং স্বামী সৌরীনের মৃত্যুর পর হতেই শ্বশুর বাড়িতে পরের দীর্ঘ ছয়টা বৎসর তার প্রতিটি দিন রাত্রির ইতিহাস শুধু অশেষ লাঞ্ছনা ও গোপন অশ্রুতে ভেজা।

বার বার মলিনার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তবু সে একমাত্র ঐ মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে সব সহ্য করেছে।

ভাই রমেন্দ্র বহুবার মলিনাকে লিখেছে, তুই তোর মেয়েকে নিয়ে চলে আয় মলি। তোর গরিব দাদার যদি দু'মুঠো অন্ন জোটে তোদেরও জুটবে।

কিন্তু তবু যায়নি মলিনা।

যতই অসম্মান বা লাঞ্ছনা হোক, এ তার শ্বশুরঘর। শ্বশুরের ভিটে।

যদি তার কোন দাবী কোথায়ও থাকে এ সংসারে তবে একমাত্র ঐ ভিটেতেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের সে সান্ত্বনাটুকুও আর রাখতে পারলো না মলিনা।

মলিনার স্বামীর সম্পত্তির অংশটা যখন ছোট দেওর লিখে দেবার জন্য বারংবার অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে, ক্রুদ্ধ আক্রোশে মলিনার চুলের মুঠি ধরে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিল সে রাত্রে, মলিনা আর সহ্য করতে পারলো না।

গভীর রাত্রে সেই দিনই ঘুমন্ত মেয়েকে টেনে তুলে নিয়ে দীর্ঘ এগার বছর পরে যে শ্বশুরের ভিটে সে এত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাতেও ছাড়েনি, সেই শ্বশুরের ভিটেই ছেড়ে অন্ধকারে মাঠের পথ ধরলো।

রাত্রির অন্ধকারে ট্রেনটা ছুটে চলেছে।

কামরা ভর্তি নানা বয়েসী যাত্রীর দল গাড়ির দুলুনীতে এ ওর গায়ের ওপর পড়ে চোখ বুজেছে।

চারিদিকে মানুষ, বোঁচকা, পোঁটলা-পুঁটলী।

তিল ধারণের স্থানও নেই।

মলিনার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মিনতি ঘুমোচ্ছে।

ছিল না কেবল ঘুম অতগুলো যাত্রীর মধ্যে একমাত্র মলিনার চোখে।

ঘুম তো নেইই।

চোখ দু'টো যেন জ্বলছে।

আঁচলে যা সম্বল আছে প্রয়াগ পর্যন্ত গিয়েও আবার ফিরে যেতে পারবে মলিনা হুগলীতে। কেবল প্রয়াগে নেমেই দাদাকে সব জানিয়ে একটা চিঠি দিতে হবে।

কিন্তু প্রয়াগে কোথায় গিয়ে উঠবে মলিনা সেই চিন্তাটাই যেন মনের মধ্যে বড় হয়ে দেখা দেয়।

তাই বাইশ বছরের জীবনে একা একা এই প্রথম তার বাইরের পৃথিবীতে পদার্পণ।

কোন রাস্তা কোন ঠিকানাই তো সে জানে না। চেনেনা বাইরের কাউকে।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় এত ভয়ই বা কিসের। যাদের এ দুনিয়ায় কেউ নেই তাদের ভগবানই আছেন। সাহস হারালে চলবে না।

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে এলাহাবাদ স্টেশনে এসে গাড়ি থামলো।

যাত্রীদের সঙ্গেই মলিনা মেয়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে গাড়ি থেকে প্ল্যাটফরমে নামলো।

ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে এক প্রৌঢ়া বিধবা মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মলিনার, তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে সে গেট দিয়ে স্টেশন থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

সম্পূর্ণ অপরিচিত শহর।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সব বিদ্যুৎবাতি জ্বলে উঠেছে।

ট্রেনের সহযাত্রিনী, নব পরিচিতা সর্বানী দেবীর পরিচিত এক ধর্মশালায় গিয়ে মলিনা মেয়েকে নিয়ে উঠলো তাঁর অনুরোধে।

হাজার হাজার পুণ্যালোভী নরনারীর ভিড়ে সেবারে শহরে যেন তিল ধারনেরও স্থান নেই।

পরের দিন স্নানযোগ।

মিনতিকে নিয়ে যাবে না মলিনা স্নান করতে। মিনতিও ছাড়বে না। কিন্তু সে যাবেই।

তুই কোথায় যাবি হতভাগী ঐ ভিড়ের মধ্যে।

না আমি যাবো। মিনতি কাঁদতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মলিনা মেয়েকে নিয়ে সহস্নান যাত্রীদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে চললো।

মানুষ, মানুষ আর মানুষ।

অত মানুষের ভিড় দেখে গাঁয়ের মেয়ে মিনতির বুকটা যেন কেমন একটা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

বিন্দু বিন্দু কপালে ঘাম জমে ওঠে।

শক্ত করে মার হাতটা চেপে ধরে সে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে!

ক্রমশঃ মাথাটা ঝিম ঝিম করে মিনতির।

ঠিক যেন আগের মতো আর সব ঠাওর করা যাচ্ছে না। আশপাশের কিছুই।

তারপরই মিনতির স্পষ্ট মনে পড়ে, বহুকণ্ঠে একটা চিৎকার শুনেছিল, নাঙ্গা সাধুর প্রসেশন আসছে।

হাতীর প্রসেশন আসছে।

এবং তারপরই চারিদিক থেকে একটা প্রচণ্ড ভীড়ের এলোমেলো চাপ।

আর সেই চাপে বিরাট জনস্রোতটা চারপাশ থেকে চাপ খেয়ে খেয়ে কেমন যেন দুমড়ে ভেঙে এদিক ওদিক হেলে ছড়িয়ে পড়ে নদীর ঢেউয়ের মতো।

বহুকণ্ঠের একটা চিৎকার, হাতী, হাতী—

ঢং ঢং ঢং অনেকগুলো ঘণ্টার আওয়াজ।

বিরাট কালো একটা মেঘ যেন, আর সেই মেঘের ভিতর থেকে আসছে একটা বিরাট ঘণ্টার ধ্বনি, ঢং ঢং ঢং ...।

তারপর।

তারপর সব যেন কেমন অস্পষ্ট ঝাপসা।

বিরাট একটা ঘন কুয়াশা চারিদিকে আর সেই কুয়াশার মধ্যে সে যেন তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ একটু একটু করে।

খুব ছোট বেলাতে একবার একা একা স্নান করতে গিয়ে গাঁয়ের পুকুরে গভীর জলের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল মিনতি।

আর সেদিনকার সেই দুঃসহ শ্বাসকষ্টটার মতোই একটা শ্বাসকষ্ট যেন ঐ মুহূর্তে বুকটাকে চেপে ধরে মিনতির।

কেবল কানে আসছিল একটা অস্পষ্ট এলোমেলো ঢং ঢং শব্দ।

এবং সেই শব্দটা অনেকক্ষণ ধরে যেন বেজেছিল।

তারপর সেটাও মিলিয়ে গিয়েছিল।

৪

মিনতি অনেক দিন ভাববার চেষ্টা করেছে তারপর কি হয়।

জ্ঞান হবার পর একটি সুসজ্জিত কক্ষে চমৎকার একটি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছে আর আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, ওখানে সে কেমন করে এলো।

এমন নরম বিছানায় তো জীবনে কখনো সে ঘুমায় নি।

চারিদিকে ঘরের দেওয়ালগুলো কি সাদা। মাথার উপরে বন্ বন্ করে কি ওটা ঘুরছে?

ভয়ে ভয়ে আবার মিনতি চোখ বুজেছে। মনের ভাবনাগুলো যেন কেমন শিথিল এলোমেলো।

অস্পষ্ট ধোঁয়াটে।

কেমন দেখছেন আজ ডাক্তারবাবু! শোনা গেল একটি মিষ্টি নারী কণ্ঠ।

আর ভয় নেই! পুরুষ কণ্ঠে জবাব এলো, এবারে সেরে উঠবে।

সত্যি তারপর সেরে উঠেছিল মিনতি একটু একটু করে।

কিন্তু এ কোথায় এলো সে।

সর্বদা যিনি তদারক করে তিনি ভারিক্কী গোছের একটি মহিলা।

গা ভর্তি গহনা। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ। চওড়া পাড় শাড়ী পরিধানে। এককালে মহিলা হয়তো দেখতে সুন্দরই ছিল কিন্তু এখন মেদ বাহুল্যে সে সৌন্দর্যের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই যেন।

আমার মা কোথায়?

তোমার মা!

হ্যাঁ!

কেন, চিনতে পারছো না, আমিই তো তোমার মা।

তুমি আমার মা!

হ্যাঁ, আমিই তো তোমার মা।

না, তুমি তো আমার মা নও।

ভাল করে চেয়ে দেখো, আমিই তোমার মা।

না, তুমি আমার মা নও—তারপর একটু থেমে মিনতি বলে, বল না আমার মা কোথায়?

পাশের ঘর থেকে ঐ সময় ভারী পুরুষ কণ্ঠের একটি ডাক শোনা গেল, সরোজ এঘরে একবার এসো।

ভদ্রমহিলা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

তখনো বুঝতে পারেনি মিনতি এ জীবনে আর সে তার মার দেখা পাবে না।

মা তার জীবন থেকে চিরদিনের মতই হারিয়ে গিয়েছে। তারপরও অনেকবার শুধিয়েছে মিনতি সেই মহিলাকে তার মার সম্পর্কে কিন্তু সেই একই জবাব পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে।

তিনিই তার মা।

এবং তারপর যেদিন তারা কলকাতায় চলে আসে, সকলের অজ্ঞাতে সেই সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি।

জানতো না মিনতি যে দরজায় দরোয়ান রয়েছে সতর্ক দৃষ্টি মেলে।

দরোয়ান তাকে দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করতেই জিজ্ঞাসা করেছিল পথ আগলে, কাঁহা যাওগে খোকী!

দরোয়ানের সেই বিরাট চেহারা, বিরাট গোঁফ, ইয়া গালপাট্টা, মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি দেখে ভয়ে পিছিয়ে এসেছিল মিনতি।

ঠিক সেই সময় সেই মহিলা গাড়ি করে এসে নামলেন দরজার সামনে চাকরের মাথায় একগাদা বাক্স নিয়ে।

দারোয়ান মণিবকে দেখে বলে, খোকী বাহার যাতে থে মাঈজী!

সে কিরে বোকা মেয়ে, আয় চল, উপরে চল! দেখবি চল তোর জন্য কত জামা কাপড় খেলনা এনেছি।

রাশীকৃত রং-বেরংয়ের জামা কাপড়, কত খেলনা, সব চারপাশে মিনতির ছড়িয়ে দিলেন মহিলা।

নাও সব তোমার—

বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকে মিনতি।

জ্ঞান হওয়া অবধি যে জেনেছে শুধু অভাব, দারিদ্র, পেয়েছে শুধু লাঞ্ছনা ও অবহেলা, চিরদিন ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে যার কেটেছে সে যেন বিহ্বল হয়ে যায় ঐ সব দেখে।

বিশ্বাস হতে চায় না।

ভয়ে ভয়ে তাকায় মহিলার মুখের দিকে।

চোখে জল এসে যায়।

ছল ছল চোখে আবার বলে, মার কাছে যাবো আমি।

মার কাছে যাবি, মা কি তোর বেঁচে আছেরে বোকা মেয়ে!

মার কাছে যাবো।

তোর মা তো সেদিন মেলায় হাতীর পায়ের চাপে মরে গেছে। আজ থেকে আমিই তোর মা! তোকে কত জিনিষ দেবো, কত ভালবাসবো।

ঐ দিনই রাত্রে মিনতি ওদের সঙ্গে কলকাতায় চলো এলো।

মস্ত বড় একটা বাড়িতে এসে ওরা উঠলো।

দোতলা বাড়িটা।

অনেকগুলো ঘর।

নানা বয়েসী কত যে মেয়ে বাড়িটায় ভর্তি।

উপরের তলায় যে চারখানা ঘর নিয়ে মিনতি ঐ মহিলার সঙ্গে থাকতো সেখানে কিন্তু কেউ কখনো আসতো না।

একমাত্র রথীনবাবু ছাড়া।

ঐ বাড়িতেই মিনতির জীবনের আরো চারটে বছর কেটে যায়।

মহিলার নাম ছিল সরোজিনী।

কি ভালই তিনি বাসতেন মিনতিকে।

তার জন্য পড়ার মাস্টার, গানের মাস্টার, নাচের মাস্টার সব নিযুক্ত করেছিলেন সরোজিনী।

নিত্য নতুন শাড়ী, নিত্য নতুন প্রসাধন, নিত্য নতুন গহনা।

দেখতে দেখতে মিনতির চেহারাটাও যেন ফিরে গিয়েছিল।

সেইসঙ্গে ক্রমশঃ মিনতি তার মার কথাও বুঝি ভুলে গিয়েছিল।

আর ভুলবেই বা না কেন। মার স্মৃতির সঙ্গে একমাত্র মায়ের স্নেহটুকু বাদ দিলে জড়িয়ে ছিল তো কেবল শুধু দুঃখ, বেদনা, অভাব আর লাঞ্ছনা—ভয় সংকোচ আর আত্মবিলুপ্তি।

বালিকা মনের কল্পনা প্রতিপদে কেবল তো ব্যহতই হয়েছে সেদিন!

একমাত্র মায়ের স্নেহ ছাড়া কি-ইবা সে আর পেয়েছে শৈশবের সেই দিনগুলিতে।

একটু একটু করে তাই মিনতি সরোজিনীকেই বুঝি ভালবাসতে শুরু করেছিল।

চতুরা সরোজিনীও তাকে ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের প্রলোভন দিয়ে যেন অক্টোপাশের মতই ক্রমশঃ আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলেন।

এবং নিজেই মিনতি ভুলে গিয়েছিল ইতিমধ্যে কখন একসময় সে সরোজিনীকে মা বলে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

আশ্চর্য লাগতো সরোজিনীকে মিনতির।

যেমন গম্ভীর প্রকৃতির তেমন রাসভারী।

সরোজিনীকে মিনতি বড় একটা বাড়ি থেকে কখনো বের হ'তে দেখেনি।

মধ্যে মধ্যে বিকালে বা সকালে কেবল সরোজিনী যা নিচে যেতেন।

নিচের তলায় সরোজিনী কখনো মিনতিকে যেতে দেন নি। শুধু নিচের তলায় কেন, বাড়ির বাইরে বড় একটা কখনো যেতে দেননি সরোজিনী মিনতিকে।

কেবল কচিৎ কখনো সঙ্গে করে রাত্রের শো'তে সিনেমায় নিয়ে যেতেন।

সেই সময়ই মিনতি যেন তার ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দিয়ে বিচিত্র কলকাতা শহরটাকে গিলে খাবার চেষ্টা করতো।

কত মানুষ জন, গাড়ি, ঘোড়া, ট্রাম, বাস, মটোর, বিরাট বিরাট সব অট্টালিকা দেখে দেখে যেন মিনতির আশ মিটতো না।

কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা নয় কেবল অবাক বিস্ময় চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখতো মিনতি। জীবনের সে যেন কয়েকটি বিচিত্র বিস্ময়কর মুহূর্ত।

এমনি করেই দেখতে দেখতে মিনতির জীবনের দীর্ঘ চারটি বছর সরোজিনীর আশ্রয়ে কেটে গেল।

বালিকা মিনতি হলো কিশোরী।

সেই সময়ই একদিন দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরে বসে কি একটা বই পড়ছে এমন সময় পাশের ঘর থেকে সরোজিনী ও রথীনবাবুর কয়েকটা কথাবার্তার আওয়াজ তার কানে আসতেই সহসা যেন পাথর হয়ে যায়।

রথীনবাবু লোকটিকে মধ্যে মধ্যে ঐ বাড়িতে দেখা যেতো।

মধ্য বয়েসী। দেখতেও বেশ সুশ্রী।

মাথার সামনের দিকটায় চক্‌চকে একটি টাক।

কোটরাগত ছোট ছোট চক্ষু।

ফরাসডাঙা বা শান্তিপুরের মিহি কোঁচান ধুতি পরিধানে ও গায়ে আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবী, পায়ে চক্‌চকে পাম-সু।

রথীনবাবুর সঙ্গে সরোজিনীর যে ঠিক কি সম্পর্ক সেটা মিনতি কোন দিনই আবিষ্কার করতে পারেনি।

তবে সরোজিনী ও রথীনবাবুর মধ্যে যে একটা বেশ হৃদ্যতা আছে সেটা কিন্তু মিনতি বুঝতে পারতো।

রথীনবাবু সরোজিনীকে 'সরোজ' বলে ডাকতো।

এবং সে এলে দু'জনে সরোজিনীর ঘরে বসে অনেকক্ষণ কি সব কথাবার্তা হতো।

সরোজিনীর কথাটা হঠাৎ মিনতির কানে এলো।

সরোজিনী—তুমি ক্ষেপেছো রথীন, দশ হাজার নগদ সেলামীর একটি আধলা কমেও আমি মীনুকে কারো হাতে তুলে দেবো না।

রথীন—কিন্তু রামদাস গোয়েঙ্কার প্রস্তাবটা আর একবার তুমি ভেবে দেখলে পারতে সরোজ!

সরোজিনী—খুব ভেবেছি। মেলা থেকে ওকে চার বছর আগে যখন আমি কুড়িয়ে পাই তখুনি বুঝেছিলাম ও ফুল অনেক দামে বিকোবে। চেয়ে দেখেছো আজকাল কি চেহারার খোলতাই হয়েছে। ওর রূপ দেখে মেয়েমানুষ আমারই মধ্যে মধ্যে মাথা ঘুরে যায়, তা....

রথীন—আহা, সেই জন্যই তো রামদাস দূর থেকে সেদিন ওকে সিনেমায় দেখা অবধি পাগল হয়ে গেছে।

সরোজিনী—পাগল! মাইরী বলছো! তাহলে মালটি কেমন খাইয়ে পরিয়ে তৈরী করেছি বলো!

রথীন—তা করেছো বৈকি। নইলে আর দাম পাবে কেন!

সরোজিনী—তাইতো ঠিক করেছি চড়া দামে এমন কারো হাতে ওকে তুলে দেবো, যাতে করে ও চিরদিনের মত রাজরানী হয়ে থাকে আর আমারও বাকী জীবনটা স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যায়। নিচের চুনো পুঁটি নিয়ে ব্যবসা করতে আর ভাল লাগে না।

রথীন—তা রামদাসের হাতে ওকে তুলে দিলে সে আশা তোমার সফল হবে, দেখে নিও!

পাশের ঘরে রথীন ও সরোজিনীর প্রত্যেকটি কথা যেন তার মাথায় মুগুরের আঘাত হানছিল। ঝিম্ ঝিম্ করে মিনতির মাথাটা।

এসব সে কি শুনছে!

ইদানিং নিচের তলার মেয়েদের গোপনে গোপনে কিছু হাবভাব দেখে আবছা যে সন্দেহটা কাঁটার মত মিনতির মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল সেটা যেন আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সরোজিনী তাহলে তাকে এতদিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করছে, এত ভালবাসা এত যত্ন ও প্রাচুর্য দিয়ে তার সর্বনাশ করবার জন্যই!

নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায় মিনতির।

যত ব্যাপারটা চিন্তা করে, তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে মিনতি ততই যেন কঠিন একটা প্রতিজ্ঞায় তার দেহটা ইস্পাতের মতই শক্ত ঋজু হয়ে যায়।

উঠে দাঁড়ায় মিনতি।

এবং সহসাই দেওয়ালে প্রলম্বিত প্রমাণ আর্সীর মসৃণ গাত্রে তার নিজের প্রতিফলিত চেহারার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মসৃণ আর্সীর গায়ে তার পূর্ণ অবয়বের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে।

মিনতি যেন সেইদিনই সেই মুহূর্তে প্রথম আবিষ্কার করে দেহের তটে রূপ যেন আরও উথলে উঠ্ছে, সাগর-জলে পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতই।

এই অনিন্দনীয় রূপ তার কামার্ত কতকগুলো পুরুষের হিংস্র নখরে ছিন্ন ভিন্ন হবে?

না, না—কিছুতেই না।

৫

সেই দিন থেকেই মিনতি লক্ষ্য করলো ও বাড়িতে রথীনবাবুর আসা যাওয়াটা যেন একটু ঘন ঘন হচ্ছে।

সরোজিনীর ঘরে বসে দু'জনার পরামর্শও চলে।

এদিকে চিন্তায় চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়ে মিনতি।

তার সদা হাস্য আনন্দোৎফুল্ল কচি মুখখানিতে একটা চিন্তার ছায়া পড়ে।

ব্যাপারটা সরোজিনীরও দৃষ্টি এড়ায় না।

কি হয়েছে তোর মীনু, দিনকে দিন মুখটা এমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন রে? সরোজিনী শুধান।

কেন, কি আবার হবে?

এক একবার মিনতি ভাবে স্পষ্টা স্পষ্টিই সরোজিনীকে সে জিজ্ঞাসা করবে কিন্তু সাহস হয় না। অথচ ভেবে ভেবেও কুল কিনারা পায় না।

আসল কথা ইদানিং সরোজিনীকে মিনতি যেন রীতিমত ভয় করতেই শুরু করেছে।

এমনি করেই আরো একটা মাস কেটে গেল।

তারপর একদিন দ্বিপ্রহরে সরোজিনী মিনতিকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

ডাকছিলে মা?

হ্যাঁ, আয় বোস—তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

ভয়ে ভয়ে মিনতি সরোজিনীর মুখের দিকে তাকালো।

কি কথা বলতে চান সরোজিনী তাকে।

বিয়ে করবি।

অবাক বিস্ময়ে তাকায় মিনতি সরোজিনীর মুখের দিকে।

কিরে হাঁদা মেয়ে, কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন! বয়স হয়েছে, বিয়ে করবি না।

মিনতি তবু নির্বাক।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে তখনো সরোজিনীর মুখের দিকে।

সরোজিনী আবার নিজে থেকেই বলেন, শোন, পরশু দোল পূর্ণিমার রাত্রে তোর বিয়ের ঠিক করেছি আমি! বিয়েতে তুই কি কি শাড়ী গয়না চাস একটা লিস্টি করে দিস। সব আনিয়ে দেবো!

তুমি! তুমি আমার বিয়ে দেবে মা!

এতক্ষণে কোন মতে কথাগুলো বলে মিনতি।

তা বয়েস হলো তোর, বিয়ে দেবো না!—শুনে খুব আনন্দ লাগছে নারে!

সহসা লজ্জায় মিনতির সমস্ত মুখখানা রক্তিম হয়ে ওঠে।

তাকাতে পারে না আর সরোজিনীর দিকে। মাথাটা নিচু করে নেয় মিনতি।

তারপরই কম্পিত পদে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা একেবারে নিজের ঘরে এসে ঢোকে।

বিয়ে।

তার বিয়ে।

ঘরের আর্সীর সামনে এসে দাঁড়ায় মিনতি।

ওগো মীনুরাণী, তোমার যে বিয়ে।

রাঙা টুক্ টুকে বর আসবে টোপর মাথায় দিয়ে।

আনন্দে চোখের কোনে জল এসে যায় মিনতির। সরোজিনী তাহ'লে তাকে দেহপণ্যা করছে না।

ছিঃ ছিঃ কি অবিচার করেছে সে সরোজিনীর প্রতি।

মা তাকে এত ভালবাসে।

যার সঙ্গে তার বিয়ে সে কেমন দেখতে কে জানে!

আজ বাদে কাল পরশুই বিয়ে।

শাঁক বাজবে উলু দেবে, মালা বদল, চার চোখের মিলন।

দুরু দুরু কেঁপে ওঠে মিনতির বুকটা!

ওগো প্রিয়তম, সত্যিই তাহলে তুমি আসছো!

সে রাতটা ঘুমতে পারে না মিনতি! বার বার ঘুমটা ভেঙে যায়।

মাঝখানে মাত্র একটা দিন।

এতবড় শুভ সংবাদটা মা তাকে এত দেরি করে দিলেন কেন বুঝতে কিছুতেই যেন পারে না মিনতি।

তবু পরের দিন সকালেই ভেবে ভেবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একটা লিস্ট করে দেয়। সরোজিনী টাকা দিয়ে লোক পাঠিয়ে সব কিনে এনে দেন।

রাশীকৃত বাক্স ও নানা আকারের প্যাকেট এনে মিনতির সামনে ফেলে দিয়ে সরোজিনী বলেন, নে দেখ, তোর সব কিছু এসেছে তো!

রথীনবাবুও সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকে বলেন, এ আর কি, যে রূপ নিয়ে তুমি জন্মেছো, এমন কত রাশীকৃত প্রত্যহ তোমার পায়ের উপর এসে লুটিয়ে দিয়ে সবাই ধন্য হবে।

রথীনবাবুর তখনকার কথাটা যেন মিনতির কানে গিয়েও যায় না।

চারিপাশে ছড়ানো তার শাড়ী গহনা ও প্রসাধন দ্রব্যগুলোর দিকে সে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে যেন বুঁদ হয়ে গিয়েছে।

রাতারাতি সে যেন রাণীর ঐশ্বর্য তার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে।

হাসতে হাসতে একসময় রথীনবাবুকে নিয়ে সরোজিনী ঘর থেকে বের হয়ে যান।

আর মিনতি অভিভূতের মত চারপাশে তখনো তার করায়ত্ব ঐশ্বর্যের দিকে নেশাভরা চোখে চেয়ে থাকে।

পৃথিবীটা এত সুন্দর, জীবনে এত মাধুর্য আনে, একথা কি সে কখনো ভেবেছে ইতিপূর্বে।

মধুময় এ জীবন, মধুময়।
শুধু বুঝি আনন্দ আর শুধু বুঝি গান।

পরের রাত্রে এলো সেই পরম লগ্ন।

নিচের তলার মেয়েরা যারা কোনদিন উপরে আসতো না, গত চার বছরে কখনো যাদের মিনতি উপরে আসতে দেখেনি, তারা সব সেজে গুজে একে একে উপরে এলো।

খিল খিল করে সব হাসে, অশ্লীল সব ইয়ার্কী দেয়, মিনতির যেন গা কেমন ঘিন ঘিন করে।

নিচের তলার মেয়েরাই তাকে নানা প্রসাধনে সাজিয়ে দেয়।

একজন ওদের মধ্যেই মিনতিকে সাজাতে সাজাতে বলে, মাইরী, কি চেহারা তোর, আমাদেরই মাথা ঘুরে যাচ্ছে তা পুরুষ তো তোর চাকর হয়ে থাকবে।

ভাল লাগে না শুনতে ঐ সব বিশ্রী নোংরা কথাগুলো, তবু মিনতি চুপ করে থাকে।

ভাবে হয়তো বা ঐ রীতি।

মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে মিনতি। আর একটা কি দুটো রাত বইতো নয়। তারপরই তো সে চলে যাবে স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর ঘরে।

স্বামী!

তার প্রিয়তম।

এতদিনে বুঝি তার সমস্ত চিন্তা ভাবনার অবসান হ'তে চলেছে।

যে অনিশ্চয়তার মধ্যে সে দিশেহারার মত কোন কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিল না, আজ এতদিনে তার ভাগ্যদেবতা তাকে নিশ্চয়তার আশ্বাস এনে দিয়েছে।

সে যেন নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।

ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন বর্তমানের সব কিছুই যেন মিনতিকে ভুলিয়ে দেয়।

ভীরু চোখের পাতা যেন কিছুতেই খুলতে চায় না।

চোখ মেলে তাকাতে পারে না মিনতি।

সামান্যই অনুষ্ঠান।

সামান্যই মন্ত্র।

বলতে গেলে যেন কিছুই নয়। কোন মতে নমো নমো করে চার হাত এক করে দিল।

কয়েকটা কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ কেবল কানে এসেছিল মিনতির।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিয়ের পাট চুকে গেল।

বরের সঙ্গে সঙ্গে তারপর মিনতি তার ঘরে এসে ঢুকলো।

বাইরে থেকে ঘরের দরজাটা টেনে দিতে দিতে কে যেন পুরুষ কণ্ঠে বললে, চললাম রে, কাল সকালে আবার দেখা হবে। বৌয়ের সঙ্গে ভাল করে আলাপ কর।

শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে পাথরের মত অবগুণ্ঠনের তলায় মিনতি তখন কেবলই ঘামছে।

ঘরের মধ্যে স্বল্প শক্তির একটা নীল বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছিল।

সেই মৃদু আলোয় দামী সিল্কের শাড়ীর অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে ভীরু চোখের দৃষ্টি তুলে দেখবার চেষ্টা করে মিনতি।

কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না।

কেবলই মনে হয়, আগাগোড়াই সবটা স্বপ্ন নয়তো।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা স্বপ্ন দেখছে না তো।

হঠাৎ স্বপ্নটা ভেঙে যাবে না তো।

ঘরের মধ্যে সে একা না সত্যিই আর কেউ আছে। কিন্তু কারোর তো কোন সাড়া শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ চোখ তুলে তাকিয়ে ভাল করে দেখবারও সাহস হয় না মিনতির।

কি একটা অজানিত আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা খালি তখন থেকে কাঁপছে আর কাঁপছে।

একটা মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল।

তারপরই দু'খানি পা।

এগিয়ে আসছে পা দুটি তারই দিকে বুঝি।

কাছে, আরো কাছে। এবারে একেবারে সামনা সামনি এসে পা দুটো থামল।

তারপরই কে যেন দু'হাত দিয়ে তার অবগুণ্ঠনটি তুলে দিল।

ভীরু চোখের পাতা যেন আপনা হতেই বুজে গেল মিনতির।

চোখ খুলবে না। চাইবে না আমার দিকে।

কণ্ঠস্বর তো নয় যেন সংগীতের দুটি চরণ! সুরে সুরে ঝংকৃত কয়টি কথা।

এত মিষ্টি কথা কি মানুষে কখনো বলতে পারে!

কই চাও আমার দিকে!

আবার সেই প্রাণ নিঙড়ানো অনুরোধ। আবার সেই গানের সুর।

শেষ পর্যন্ত চোখের পাতা খুলতেই হয় মিনতিকে।

ঘরের সেই নীল আলোয় তাকায় সামনের দিকে।

প্রশস্ত ললাট।

রুক্ষ এলোমেলো মাথার চুল।

দুটি জোড়া ভ্রুর মাঝখানে দীর্ঘ একটি ক্ষত চিহ্ন!

ক্ষত চিহ্ন নয় মনে হলো যেন রাজতিলক।

টানা টানা দুটি চক্ষু। পুরু ওষ্ঠ। ওষ্ঠের উপরে সূক্ষ্ম একটি গোঁফের রেখা।

কি নাম তোমার?

মিনতি! ডাক নাম মীনু—

মীনু! আমিও তোমাকে মীনু বলেই ডাকবো, কেমন?

মৃদুভাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় মিনতি।

আশ্চর্য!

কি! মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে মিনতি।

টাকার আমার অভাব ছিল সত্যি! আর সুবোধ যখন বিয়ের কথা বলেছিলো সেই টাকার লোভেই রাজী হয়েছিলাম, তাও সত্যি। কিন্তু টাকার সঙ্গে সঙ্গে যে তোমাকে পাবো এ সত্যিই আমার স্বপ্নেরও বুঝি অতীত ছিল।

কেন?

প্রশ্নটা করে ভীরু দৃষ্টিতে তাকায় মিনতি তার স্বামীর মুখের দিকে।

কেন! মৃদু হাসলো সে।

আমার ওপরে আপনি রাগ করেননি তো?

রাগ! কেন বলতো?

আপনি বিশ্বাস করুন, একটু আগে আপনি যা বললেন সে সব কিছুই আমি জানিনা।

তোমার মা যে আমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে তোমাকে বিয়ে করতে সম্মত করিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই তুমি জানো না!

না।

আশ্চর্য! তোমার মা আমার সঙ্গে কড়ার করেছিলেন—

কড়ার?

হ্যাঁ, বলেছিলেন তোমাকে শুধু আমাকে বিয়েই করতে হবে। স্ত্রীর কোন দায়িত্বই নাকি জীবনে আমাকে নিতে হবে না। এমন কি ইচ্ছা করলে আবার আমি বিয়েও করতে পারি।

আপনি—আপনি কি তাহলে আমাকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করবেন!

না মীনু! তোমাকে দেখার আগে মনে আমার যাই থাক না কেন, আজ থেকে তুমিই হলে আমার স্ত্রী! জেনো আর কখনো দ্বিতীয় নারী আমার জীবনে আসবে না।

সত্যি—সত্যি বলছেন?

দু'হাতে সেদিন পরমুহূর্তেই মিনতির স্বামী মিনতিকে বুকের একেবারে মাঝখানটিতে টেনে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, এর চাইতে বড় সত্য জীবনে আর আমার কিছুই নেই জেনো।

ঠিক সেই সময় দরজাটা খুলে গেল ঘরের।

সরোজিনী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

আয় মিনতি, তোদের খাবার দেওয়া হয়েছে। এসো বাবা—রাত অনেক হলো এবারে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমাবে।

সে রাত্রে মিনতির খাওয়ার ইচ্ছা একটুও ছিল না।

কিন্তু সরোজিনী শুনলেন না।

শেষ পর্যন্ত কিছু মিষ্টি খেয়ে দু'জনে দু গ্লাস সরবৎ খেয়ে ঘরে ফিরে এলো।

দু'জনারই ইচ্ছা ছিল সে রাতটা তারা ঘুমাবে না।

জেগেই রাতটা কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে যে কি ঘুমই মিনতির দু'চোখ ভরে নেমে এলো, কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারে না।

করুণ কণ্ঠে মিনতি বলে, বড্ড ঘুম পাচ্ছে যে।

মিনতির স্বামী বলে, আমারও।

কিন্তু ঘুমাতে যে আমি চাই না মীনু!

আমিও চাই না!

তবু তারা সে রাত্রে কেউ জেগে থাকতে পারেনি।

দু'জনাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

উঃ! কি কাল ঘুমই যে সে রাত্রে তার দু'চোখ ভরে নেমেছিল।

হায়রে। যদি না ঘুমাতো!

ঘুম ভাঙলো পরের দিন সকালে সরোজিনীর ডাকে।

অ মীণু, আর কত ঘুমাবি মা, ওঠ, ওঠ—ঘরে যে রোদ এসে গিয়েছে।

তবু যেন মিনতির ঘুম ভাঙতে চায় না।

অতি কষ্টে চোখের পাতা দুটো টেনে তাকায় মিনতি।

ওঠ্ মা অনেক বেলা হয়েছে। যা হাত মুখ ধুয়ে চা খাবি আয়।

আরো কিছুক্ষণ পরে মিনতি যখন ঘুমক্লান্ত ভারী চোখের পাতা মেলে চারপাশে তাকালো শয্যার ওপর উঠে বসে, প্রথমেই তার মনে হলো কি যেন ঘরের মধ্যে নেই।

ঘরটা যেন কেমন খালি খালি মনে হচ্ছে।

কি নেই, কেন নেই, প্রথমটায় ঠিক যেন ঘুমক্লান্ত চেতনার উপলব্ধিতে পৌঁছায় না।

কিন্তু সেটা বেশীক্ষণের জন্য নয়।

বুঝতে পারে সে ঘরে তার স্বামী নেই।

আশ্চর্য!

এত সকালে ঘর ছেড়ে কোথায় গেলেন তিনি।

পরক্ষণেই মনে হয় হয়তো মার ঘরেই তিনি আছেন।

ক্লান্তি ভরে একটা হাই তুলে, দীর্ঘ ঘুমের শিথিল দেহে আড়মোড়া ভেঙে শয্যা থেকে নেমে সোজা চলে যায় মিনতি বাথরুমে।

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দিতে দিতে একটু একটু করে গত রাত্রির সব কথা মনে পড়ে। জীবনে কালকের রাতটা যেন একটা স্বপ্ন।

গল্পে পড়া পরীর দেশ থেকে একটা মধুর স্বপ্ন যেন নেমে এসেছিল জীবনের পাতায়।

দু'জনাই মনে মনে স্থির করেছিল রাতটা তারা কিছুতেই ঘুমাবে না।

মুখোমুখি বসে বসে আর কথা বলে বলে রাতটা কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু কি ঘুম যে নেমে এলো চোখের পাতায়!

সলজ্জ একটুখানি হাসি জেগে ওঠে মিনতির ওষ্ঠপ্রান্তে।

ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা, কি লজ্জা!

কি ভাবলেন তিনি! ঘুমাবে না বলেও সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঠিক আছে, আজ রাত্রে সে ঘুমাবে না। কিছুতেই ঘুমাবে না।

যত ঘুমই আসুক সে জেগে থাকবেই।

নিশ্চয়ই জেগে থাকবে। নিশ্চয়ই!

ঘরে ফিরে এসে জামা কাপড় বদলাতে বদলাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিনতি আবার যেন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

পাশের ঘরে গিয়ে মুখ দেখাবে তাঁকে ও কেমন করে।

তারপর যখন জিজ্ঞাসা করবেন, কি গো মীনুরাণী, ঘুমাবে না বলেও ঘুমিয়ে পড়েছিলে যে?

কিন্তু পাশের ঘরে এসে পা দিয়েই যেন থমকে দাঁড়ায় মিনতি।

কই, ঘরে তো তিনি নেই।

টেবিলের ওপরে প্লেটে খাবার, সরোজিনী কাপে চা ঢালছেন, একটা চেয়ারে বসে রথীনবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন।

সামনেই তার টেবিলের ওপরে পড়ে একাট শূন্য প্লেট।

সরোজিনী ডাকেন, আয় বোস। কাল তো কিছুই খাসনি! আজ কিছু খা।

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই মিনতি গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসলো। কিন্তু কি জানি কেন, চা বা খাবার ওর গলা দিয়ে যেন নামতে চায় না, অকারণেই চোখের কোল দু'টো জলে ভরে আসে।

আকুলি বিকুলি করে তার প্রাণটা সংবাদটা পাবার জন্য, কিন্তু কেমন করে শুধাবে সে সেই কথা!

কোন লজ্জায় সে জিজ্ঞাসা করবে, তাঁকে দেখছি না কেন! তিনি কোথায় গেলেন মা!

কিরে খা! কিছুই যে খাচ্ছিস না, সরোজিনী বলেন।

মৃদু কণ্ঠে মিনতি কেবল বলে, ইচ্ছা করছে না মা খেতে!

সে কিরে, কাল তো কিছুই গোলমালে খাসনি!

ভাল লাগছে না। বলে টেবিল থেকে উঠে পড়ে মিনতি।

তারপর ক্রমে বেলা গড়িয়ে যায়।

দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা—তবু তার দেখা নেই।

অসহ্য একটা আকুতিতে ছট্ ফট্ করতে থাকে মনে মনে মিনতি।

তবে কি! তবে কি তিনি সত্যিই তাকে ফেলে চলে গেলেন।

না, না—নিশ্চয়ই না।

তিনি যে কাল রাতে তার হাত দু'টি ধরে বলেছেন, সেই তার স্ত্রী।

শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার পর সরোজিনী এসে যখন তাকে গা ধুয়ে সাজগোজ করতে বললেন তখন আর চুপ করে থাকতে পারে না মিনতি।

মা! মিনতি সহসা ডাকে।

ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন সরোজিনী। মিনতির ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন।

বললেন, কি রে!

তাকে—তাকে দেখছি না কেন মা!

কাকে রে! পরক্ষণেই বুদ্ধিমতী সরোজিনী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বলেন, ও কালকের সেই ছেলেটি?

হ্যাঁ—

ব্যস্ত কি! আজ রাত্রেই আসবেখন।

আঃ, ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে মিনতির সরোজিনীর কথায়।

সারাটা দিনের সমস্ত দুর্ভাবনা চিন্তা যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়।

আনন্দের লঘুপক্ষ মেলে যেন ওর মন নতুন স্বপ্নের দেশে উড়ে চলে।

গা ধুয়ে আজ নিজেই নিজের প্রসাধন শুরু করে মিনতি।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই কেশ রচনা করতে করতে গুণ গুণ করে গান গায় ঃ

শতেক বরষ পরে
বধূয়া মিলাল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস—

কপালে এঁকে দেয় ঝোরো কুমকুমের টিপ! চোখের কোণে কাজল, ওষ্ঠে লিপস্টিক! রাশীকৃত শাড়ী একটার পর একটা অঙ্গে জড়ায় কিন্তু কোনটাই যেন পছন্দ হয় না মিনতির, শাড়ীর কোন রঙটি তিনি পছন্দ করেন, কে জানে?

সাদা, লাল, নীল, সবুজ জাফরানী না ভায়োলেট না সিল্ক।

অনেক বেছে অনেক দেখে একটা ফিকে নীল রঙের সিল্কের শাড়ী পরিধান করে মিনতি। কানে দেয় কর্ণাভরণ, হাতে বলয় চুড়ি, কঙ্কণ, গলায় হার।

নানান ছাঁদে ঘুরে ফিরে আর্সীর বক্ষে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। মনে হয় কেবলই কোথায় যেন কি বাকী রয়ে গেল।

তার মনোমত সাজ যেন হয়নি পরা।

তারপর ঘরের মধ্যে পালঙ্কের উপরে বসে ভেজানো দরজাটির দিকে চেয়ে চেয়ে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রহর গোনা।

৭

ঢং ঢং ঢং...

রাত্রি দশটা বাজবার একটু পরেই সহসা ঘরের ভেজানো দরজাটা গেল খুলে।

সঙ্গে সঙ্গে ভীরু সলজ্জ চোখের মিষ্টি মিনতির আপনা থেকেই যেন বুজে আসে।

ছিঃ ছিঃ, উপযাচিকার মতো সে জানিয়ে দেবে নাকি, এতক্ষণ তাঁরই প্রতীক্ষায় সে সেজে গুজে বসে আছে।

একটা মধুর সম্বোধন।

একটা মধুর স্পর্শের লোভে, প্রতীক্ষায় ব্যাকুল স্বেদ সিক্ত দেহটা তার রোমাঞ্চিত, শিহরিত হয়ে ওঠে।

মৃদু পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গত রাত্রির মতই ঘরের দরজাটা বন্ধ করার শব্দটা শোনা গেল।

এতক্ষণ অদর্শনের অভিমানে, প্রতীক্ষার আনন্দে একটিবারও যে কথাটি মনে পড়েনি, সহসা ঘরের মধ্যে পদশব্দে সেই কথাটি-ই যেন মনে পড়ে গেল মিনতির!

বইতে পড়েছে সে, বিবাহের পরের রাত্রিই তো কালরাত্রি।

আজ রাতে তো স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মুখ দেখতে নেই।

তবে সব দেখে শুনেও মা এ কি করলেন।

তবে—তবে কি সে ফিরিয়ে দেবে।

বলবে কি—প্রিয়তম, আজ নয়, আজকের রাতটা কালরাত্রি।

কিন্তু ততক্ষণে পদশব্দ একেবারে কাছাকাছি এসে গিয়েছে।

বাঃ চমৎকার! চমৎকার সেজেছো তো রাণী!

অপরিচিত পুরুষকণ্ঠে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই যেন পরমুহূর্তে, সব কিছু ভুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে, সামনের দিকে তাকাতেই পাথর হয়ে গেল বুঝি মিনতি।

নিজের অজ্ঞাতেই অস্ফুট ভয়ার্ত একটা আর্ত চিৎকারের মতই কণ্ঠ দিয়ে তার একটি মাত্র শব্দ, একটি মাত্র প্রশ্ন বের হয়ে এলো, কে? কে—

একেবারে অতি নিকটে দাঁড়িয়ে নাদুস নুদুস চেহারা, দামী ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত ইয়া গোঁফ—এক অপরিচিত পুরুষ।

দু চোখের দৃষ্টি তার বন্য লালসায় যেন মিনতির সর্বাঙ্গ লেহন করছে।

কে বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ায় মিনতি শয্যা থেকে।

কে? কে আপনি! এ ঘরে, এ ঘরে কেন আপনি এসেছেন! বলেই চাপা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, মা! মা—

হোঃ হোঃ করে কুৎসিৎ হাসিতে লোকটা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

ভয় পেলে রাণী, ভয় কি! আমিও তোমাকে ভালোবাসবো বলতে বলতে চোখের সেই কুৎসিত চাউনি দিয়ে মিনতির সর্বাঙ্গ লেহন করতে করতে লোকটা তার রোমশ দুই বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে আসে ওর দিকে।

বিদ্যুৎ চমকের মতই যেন সরে যায় বাঁ দিকে মিনতি লোকটার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে বাঁচাতে।

লোকটা আবার হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে।

ভয় পাচ্ছো কেন সুন্দরী! আমি তোমায় রাজরাণী করে রাখবো! গাড়ি, বাড়ি, গয়না সব—সব দেবো। বলতে বলতে আবার লোকটা এগিয়ে আসে।

ছুটে ঘরের এককোণে চলে যায় মিনতি।

চিৎকার করে আবার ডাকে, মা—

আরে পাগলী, তোর মা-ই তো এ ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। গুণে গুণে পাঁচ পাঁচটি হাজার টাকা দিয়েছি না। কাল আবার পাঁচ হাজার দিতে হবে।

লোকটার শেষের কথাগুলো যেন কানে গরম শিষে ঢেলে দিল মিনতির।

তবে, তবে কি সবই তার মা-র কারসাজী!

মায়েরই ষড়যন্ত্র।

তার মা-ই তাকে ঐ নরপিশাচটার হাতে তুলে দিয়েছে।

মিনতি যত লোকটার নাগাল থেকে সরে যাবার চেষ্টা করে, সে-ও যেন ততই ওকে ধরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

কি করবে, কি করবে মিনতি?

কি করে ঐ পাষণ্ডটার হাত থেকে সে রেহাই পাবে।

কোন পথে পরিত্রাণ তার।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় মিনতির একটা কথা।

দোতলার দক্ষিণ দিকের ব্যালকনীটা তারই ঘরের সংলগ্ন। তার ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজাটা দিয়ে সেই ব্যালকনীতে যাওয়া যায়।

চেয়ে দেখলো মিনতি ব্যালকনীর দরজাটা তখন খোলাই রয়েছে।

লোকটা ততক্ষণে আবার এগিয়ে আসছে তার দিকে।

চোখের মণি দুটো যেন বর্বর ক্ষুধায় জ্বলছে।

না, না—যেমন করেই হোক তাকে পালাতেই হবে।

ঘরের দরজাটা আগেই খুলবার চেষ্টা করেছিল মিনতি কিন্তু দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ।

তাতে সে আরো বুঝেছিল এ সবই তার মা, সরোজিনীরই শয়তানী।

লোকটা সহসা দুহাত বাড়িয়ে বাহু বন্ধনে ধরে ফেলতেই অনোন্যপায় মিনতি, সজোরে লোকটার ডান হাতের উপরে দাঁত বসিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা চিৎকার করে লোকটা তাকে মুহূর্তের জন্য ছেড়ে দিতেই, একেবারে ছুটে গিয়ে ব্যালকনীতে প্রবেশ করে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল মিনতি।

নিচেই রাস্তা। রাস্তাটা তখন প্রায় নির্জন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কোথায় যাবে সে।

কিন্তু তখন বুঝি আর অতশত ভাববারও সময় ছিল না।

রেলিং টপকে পরক্ষণেই পাগলের মতই যেন নিচে ঝাঁপ দিল মিনতি চোখ কান বুজে।

মন্থর গতিতে একটা হুড খোলা মটোর গাড়ি এ সময় নিচের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এবং একটি মাত্র লোক আরোহী ছিল গাড়িতে। এবং সেই চালাচ্ছিল গাড়ি।

ঝুপ করে একেবারে মিনতি গিয়ে সেই গাড়ির পিছনের গদীর উপর পড়লো।

থতমত খেয়ে লোকটা গাড়ি থামিয়ে দেয় সেই শব্দ শুনে ও একটা ঝাঁকুনি খেয়ে, সহসা ব্রেকটা চাপে।

হাতের কনুই ও পায়ে খুব আঘাত লেগেছিল মিনতির।

কিন্তু সে কথা ভাববার তখন তার অবস্থা নয়।

কোন মতে সে উঠে বসে।

মাথাটা তখনও ঝিমঝিম করছে।

এদিকে গাড়ির চালক পিছন ফিরে রাস্তার গ্যাসের আলোয় অপূর্ব সুন্দরী ও দামী বেশভূষায় সজ্জিতা তার গাড়ির মধ্যে এক কিশোরীকে দেখে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, কে! কে তুমি?

ছেড়ে দিন, গাড়ি ছেড়ে দিন—নইলে এখুনি হয়তো ওরা আমাকে ধরে ফেলবে।

কিন্তু কে! কে তুমি!

বলবো, সব বলবো আপনাকে, আগে আপনি আমাকে বাঁচান। ধরতে পারলে ওরা আমার সর্বনাশ করবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে মিনতি বলে।

হঠাৎ ঐ সময় উপরের ব্যালকনীতে একজন মানুষ দেখা গেল।

মিনতি আবার করুণ কণ্ঠে মিনতি জানায়, কি করছেন আপনি, চলুন এখান থেকে তাড়াতাড়ি।

কি ভেবে এবারে চালক গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনেকটা পথ গাড়ি চালিয়ে অবশেষে গাড়ির চালক একটা বড় পার্কের সামনে এসে গাড়িটা থামালো।

এবারে চালক মুখোমুখি তাকালো মিনতির দিকে ঘুরে।

রাস্তার ইলেকট্রিক পোস্টের আলো মিনতির চোখে মুখে সর্বাঙ্গে এসে পড়েছে।

অনেক রাত, রাস্তাটা একেবারে নির্জন!

কে তুমি বলতো! আর কেনই বা অমন করে নিচে লাফিয়ে পড়েছিলে, যদি আমার গাড়ির উপর এসে না পড়ে রাস্তায় পড়তে! মরে যে একেবারে ভূত হয়ে যেতে!

মিনতি চুপ করে থাকে।

শুধু তার চোখের কোল দুটো অশ্রুতে ছল ছল করে ওঠে।

কি আশ্চর্য! কথা বলছো না কেন, কি নাম তোমার।

মিনতি।

মিনতি! তা অমন করে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলে কেন!

ভয়ে!

ভয়ে! কিসের ভয়ে!

একটা লোক আমার সর্বনাশ করবার জন্য—আর বলতে পারে না মিনতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

আরে—কাঁদছো কেন! সব কথা খুলেই বল না!

আপনি, আপনি আমাকে—বাঁচাবেন বলুন! বলতে বলতে জল ভরা চোখে এতক্ষণে ভাল করে তাকালো মিনতি লোকটার মুখের দিকে।

চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে লোকটার বয়স হবে, রোগা চেহারা। দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো, পরিধানে স্যুট।

সে দেখবোখন। আগে বলতো ব্যাপারটা কি।

মিনতি তখন সংক্ষেপে তার অতীত কাহিনী বলে যায়।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব কথা শুনে লোকটি বলে, তাইতো তাহ'লে এখন কি করবে, কোথায় যাবে?

আমার স্বামীকে কি আমি খুঁজে বের করতে পারবো না?

লোকটি মিনতির ইতিহাস শুনে মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। মৃদু হেসে বললে, তার নাম ধাম ঠিকানা তো কিছুই জানো না। খুঁজে বের করবে কি করে।

সে আমি নিশ্চয়ই পারবো। তাঁকে দেখলেই আমি চিনতে পারবো।

এবারেও লোকটি মৃদু হাসলো।

তারপর বললে, তা সেতো পরের কথা। এখন কোথায় যাবে?

আপনি বলুন কোথায় যাবো!

আমি বলবো?

হ্যাঁ। তা ছাড়া কে আর বলবে। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবো।

তার চাইতে চল থানায় গিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

না, না—থানায় আমি যাবো না। তারা তাহ'লে নিশ্চয়ই আবার আমাকে তাদের হাতেই তুলে দেবে।

না, না—তা কেন হবে। থানাতে সব কথা তুমি বলবে।

না—থানায় আমি যাবো না।

তবে কোথায় যাবে?

আপনার বাসায় কয়দিনের জন্য আমাকে একটু স্থান দিতে পারেন না।

আমার বাসায়।

হ্যাঁ, তারপর আমার স্বামীকে খুঁজে পেলেই আমি চলে যাবো।

কি ভেবে লোকটি এবারে বললে, বেশ! বেশ তাই না হয় আজকের রাত্রের মত চলো।

৮

লোকটির নাম রতিকান্ত মল্লিক।

সিনেমা ও থিয়েটারের অভিনেত্রীর জোগান দেওয়াই তার পেশা।

গত আট বৎসর থেকে রতিকান্তর ঐ ব্যবসা।

এবং ব্যবসায় তার বেশ দু'পয়সা উপার্জনও হয়।

সিনেমা ও থিয়েটার লাইনে ঘুরলেও রতিকান্তর আজ পর্যন্ত কিন্তু কেউ কোন তার চরিত্রে বদনাম দিতে পারেনি।

ছোট সংসার।

রতিকান্ত ও তার স্ত্রী মল্লিকা।

মল্লিকা সন্তানহীনা।

রীতিমত রাশভারী মেয়েলোক মল্লিকা। গিন্নীবান্নী প্যাটার্ণের চেহারাটি। এবং স্বামী রতিকান্তর উপরে তার অসাধারণ প্রতিপত্তি।

সাদা কথায় রতিকান্ত মল্লিকাকে রীতিমত ভয়ই করে, যদিও মুখে সেটা কখনোই সে প্রকাশ করে না।

বরং উল্টোটাই বন্ধু মহলে রতিকান্ত গলা উঁচিয়ে প্রকাশ করে, স্ত্রী জাতটাকেই কখনো কোন ব্যাপারে ইমপরেণ্টেস্ দিতে নেই। তা হলেই তারা মাথায় চেপে বসবে।

বন্ধুরা যদি কখনো প্রতিবাদ করে বলেছে, এটা কিন্তু তোমার ভুল ধারণা রতিকান্ত।

ভুল মানে, মেয়েদের ব্যাপার কতটুকু তোমরা জানো?

তা তোমারও তো একটিরই একস্‌পিরিয়েন্স্। বন্ধুটি হয়তো বলেছে।

ডোণ্ট টক রাবিশ। বলে সারাটা জীবন মেয়েদের নিয়ে কাটিয়ে দিলাম। ওরা হচ্ছে সেই জাত, লাই দিয়েছো কি, দুদিনেই বলবে তোমাকে গো টু হেল। ওদের কাছে থাকতে হবে স্ট্রং আয়রণের মতো। ওরা যদি বলে ডাইনে চলো, তুমি বলবে, নো, টু দি লেফট্!...

কিন্তু ঘনিষ্ঠ দু একজন যারা রতিকান্তর বাড়ির ভিতরের সংবাদটা জানতো তারা কিন্তু রতিকান্তর কথায় মৃদু মৃদু হাসতো।

হয়তো বাইরে প্রচণ্ড ধারায় বর্ষা নেমেছে, রতিকান্ত স্ত্রীকে ডেকে বললে, ওগো শুনছো, এক কাপ বেশ স্ট্রং করে চা করে দেবে!

স্ত্রী হয়তো আদা মরীচ, তেজপাতা ও মিছরী সহযোগে এক গ্লাস গরম গরম কাত্ করে এনে সামনে ধরলো।

একি!

মিছরির কাত্—খেয়ে নাও। ঠাণ্ডায় বেশ কাজ দেবে!

কিন্তু আমি যে বললাম চা—

সকাল বেলাতে এক চাপ খেয়েছো, খালি খালি চা খেলে ডিস্‌পেপসিয়া হবে। এবং বলাই নয়, সেই কাত্ সবটুকু স্বামীকে খাইয়ে, ঘরের জানলা দরজা

বন্ধ করে, একটা উলের কমর্ফটার এনে স্বামীর গলায় জড়িয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। তারপর হয়তো কোন দিন যদি রাত করে রতিকান্ত ফিরেছে, মল্লিকা সারাটা রাত ধরে প্রশ্নবানে করবে তাকে জর্জরিত।

দিন দিন দেখছি তোমার পাখা গজাচ্ছে। মল্লিকা হয়তো বলেছে।

তার মানে!

মানেটা যে কি তা কি আমি বুঝি না ভাবো! কথায় বলে ঘি আর আগুন—

কি বলছো মল্লিকা!

হ্যাঁ, ঐ সব মেয়েছেলেদের নিয়ে কারবার করো আর যাই করো সন্ধের পরেই ফিরতে হবে জেনো।

ভয়ে ভয়ে অতঃপর রতিকান্ত চুপ করেই থাকে, কি জানি মল্লিকা যদি বাইরে যাওয়াই একেবারে বন্ধ করে দেয়।

গাড়ি চালাতে চালাতে রতিকান্ত গৃহিনী মল্লিকার কথাই ভাবছিল।

একে নতুন একজন হিরোয়িনীর খোঁজে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তারপর যদি সঙ্গে করে এত রাত্রে ঐ সুন্দরী কিশোরীটিকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে হাজির করে, মল্লিকা না একটা কেলেঙ্কারী করে বসে, এত রাত্রে চেঁচামেচি করে।

মিনতির প্রস্তাবে রাজী হওয়ার অবশ্য আরো একটি কারণও ছিল রতিকান্তর।

মেয়েটাকে যদি কাজে লাগানো যায় তো মোটা অর্থ প্রাপ্তি হবে মনে মনে সে ইতিমধ্যেই কথাটা ভাবতে শুরু করেছিল।

অনুচিত রায় তার নতুন বইয়ের জন্য একটি নবাগতা হিরোয়িন খুঁজছে।

এ মেয়েটিকে দেখলে অনুচিতের মাথা একেবারে ঘুরে যাবে।

কিন্তু সরাসরি মেয়েটিকে নিয়ে একেবারে বাড়ির মধ্যে তোলা হবে না।

বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে আগে মল্লিকার সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিতে হবে। তারপর। নচেৎ বিশ্বাস নেই মল্লিকাকে।

বাড়ির কাছাকাছি প্রায় এসে রতিকান্ত মিনতিকে সম্বোধন করে বললে, ইয়ে মানে একটা কথা তোমাকে বলতে চাই মিনতি।

কি!

বাইরের ঘরে তুমি একটু অপেক্ষা করবে। আমার স্ত্রীকে ডেকে এনে আগে তার সঙ্গে তোমার পরিচয়টা করিয়ে দেবো।

তিনি আমাকে থাকতে দেবেন তো!

দেবেন না মানে। নিশ্চয়ই দেবেন! অমন কাইণ্ড হার্টেড্ ব্রড্ মাইনডেড্ লেডি তুমি বড় একটা দেখোনি! আমার স্ত্রী বলে বলছি না, দেখবে আলাপ হলে, তা

ছাড়া আমার বাড়িতে তোমাকে আমি স্থান দিচ্ছি, তার বলবার কি থাকতে পারে। আর বললেই বা শুনছে কে, আই ডোণ্ট্ কেয়ার!

রতিকান্তর এলোমেলো কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারে না মিনতি।

তবে জবাবও দেয় না।

উত্তেজনায় এতক্ষণ বুঝতে পারে নি।

কিন্তু এখন সর্বশরীর বেদনায় যেন-টন্‌টন্ করছিল। বিশেষ করে কনুই আর পা যেন ব্যথায় ভেঙে যাচ্ছে।

ভবানীপুর অঞ্চলে বকুলবাগান রোডের উপরেই রতিকান্তর বাড়ি।

বাড়িটা পৈতৃক হলেও নেহাৎ ছোট নয়।

দোতলা বাড়ি। উপর নিচে সর্বসমেত আটখানি ঘর। সংলগ্ন একটি গ্যারাজও আছে। অতগুলো ঘর প্রয়োজন নেই বলে উপরের তলাটা ভাড়া দিয়ে নিচের তলাতেই রতিকান্ত থাকে।

গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দিয়ে কলিংবেল টিপতেই চাকর হরিয়া এসে দরজা খুলে দিল।

বাইরের ঘরে মিনতিকে বসতে বলে রতিকান্ত ভয়ে ভয়ে অন্দরে গিয়ে ঢুকলো মধ্যবর্তী দরজা পথে। শয়ন ঘরে আলো জ্বলছে।

রতিকান্ত বুঝতে পারে স্ত্রী মল্লিকা তার অপেক্ষায় তখনো জেগে।

বসবার ঘরের পাশের ঘরটিই রতিকান্তর শয়ন ঘর!

মাঝখানে একটি দরজা।

ঘরে ঢুকে মধ্যবর্তী দরজার কপাট দুটো ওদিক থেকে টেনে ভেজিয়ে দিলেও পাশের ঘরের যাবতীয় কথাবার্তা মিনতির কানে আসে।

মলি?

এত রাত হলো ফিরতে?

হয়ে গেল। মানে হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেণ্ট্—

অ্যাকসিডেণ্ট্।

হ্যাঁ, মানে একটা মেয়ে—

ও, মেয়েছেলে নিয়ে স্ফুর্তী করতে গিয়েছিলে।

আঃ, কি যে চেঁচাও—

চেঁচাবো না মানে! বলি তুমি ভেবেছো কি!

আঃ মল্লিকা—মেয়েটি পাশের ঘরে বসে আছে, শুনতে পাবে—

কি! একেবারে বাড়িতে এনে তুলেছো।

ঐ দেখো! বাড়িতে তুলবো কেন! আগে শোনোই না ছাই কথাটা!

শোনাচ্ছি! দাঁড়াও—দু'জনকেই ভাল করে শোনাচ্ছি—

মিনতির অবস্থা তখন ন যযৌ ন তস্থৌ।

কি করবে সে ভেবে পায় না।

পরক্ষণেই ঘরের দরজার কপাট খুলে মল্লিকা এসে ঘরে ঢুকলো।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই ভীত শংকিত অথচ ইন্দ্রানীর মতো সুসজ্জিতা রূপবতী মিনতিকে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যেন দাঁড়িয়ে যায় থমকে।

কয়েকটা মুহূর্ত মুখ দিয়ে তার যেন কোন কথাই সরে না।

ভীরু শংকিত দৃষ্টিতে মিনতি চেয়ে আছে মল্লিকার মুখের দিকে।

পিছু পিছু তখন রতিকান্তও এসে দাঁড়িয়েছে মল্লিকার পশ্চাতে।

আমাকে, আমাকে—তাড়িয়ে দেবেন না দয়া করে। তাহলে তারা আমার সর্বনাশ করবে।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার স্বামীর সন্ধান পেলেই আমি,—আমি এখান থেকে চলে যাবো।

কান্নাঝরা সুরে মিনতি একটানা কথাগুলো বলে যায় এবং পরক্ষণেই সহসা ছুটে এসে মল্লিকার পায়ের কাছে উপুর হয়ে পড়ে।

ঘটনার আকস্মিকতায় মল্লিকা যেন কেমন বিহ্বল হয়ে যায়।

মেয়ে মানুষ সে, মিনতিকে বুঝতে তার দেরি হয় না।

আহা! ওঠো—ওঠো—

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সস্নেহে মল্লিকা মিনতিকে তুলে ধরে।

কি নাম তোমার?

মিনতি!

স্বামীর কথা তোমার কি বলেছিলে, বিয়ে হয়েছে?

ঐ সময় রতিকান্ত কথা বলে ওঠে, সে অনেক কথা মল্লিকা! একটা লোমহর্ষক ব্যাপার—

তুমি যাওতো পাশের ঘরে।

না মানে—আমি বলছিলাম কি—

কিছু বলতে হবে না। যাও, রাত অনেক হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে বোস গিয়ে আমি আসছি!

স্বামীকে কথাগুলো বলে এবারে মল্লিকা মিনতির দিকে ফিরে তাকায়, বলে, চলো, ভিতরে চলো, তোমার কথা সব শুনাবো'খন।

অতঃপর মল্লিকাই মিনতির হাত ধরে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে।

রতিকান্তকে খাইয়ে শয্যায় পাঠিয়ে দিয়ে মল্লিকা মিনতিকে নিয়ে গিয়ে অন্য একটি ঘরে মুখো-মুখি বসলো।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মল্লিকা মিনতির যাবতীয় ইতিহাস শুনলো।

আসলে মল্লিকা বাইরে একটু খিট-খিটে প্রকৃতির হলেও মনটি কিন্তু ছিল তার ভারি কোমল।

এবং মিনতির ইতিহাস শুনতে শুনতে মল্লিকার দু'চোখের কোণে জল জমে ওঠে।

বেচারী।

মল্লিকা মিনতিকে দু'হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, কোন চিন্তা নেই তোমার। এখানে এসে পড়েছো যখন, যতদিন তোমার স্বামীকে না খুঁজে পাও এখানেই থাকবে।

পরের দিন সকালে মল্লিকা স্বামীকে বললে, ও এখানেই থাকবে।

হ্যাঁ, দু চারটে দিন থাকুক না! অনুচিতবাবু তার বইয়ের জন্য একজন নায়িকার কথা বলছিলেন—

কি বললে, দেখো ওকে নিয়ে ঐ সব মতলব করতো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন—

আরে না, না—তাই বলছি নাকি আমি। আমি বলছিলাম—

তুমি যা বলেছিলে তা হবে না। ভদ্র ঘরের বৌ যাবে ফিল্মে অভিনয় করতে! ওর জন্য তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। ওর যা করবার আমি করবো।

তা, তা—হলে তো ভালই হয়। তা বেশ, তা বেশ—কোন মতে রতিকান্ত তখনকার মত স্ত্রীর সামনে থেকে যেন পালিয়ে বাঁচে।

কিন্তু ইচ্ছেটা তার মনের মধ্যে কেবলই ঘুরতে থাকে।

যেমন করে হোক ওকে ফিল্মে নামাতেই হবে।

মিনতি রতিকান্তর গৃহেই স্থান পেল।

কিন্তু যে কারণে মিনতি জীবন পর্যন্ত সংশয় করে সরোজিনীর আশ্রয় থেকে অমন করে দোতলা থেকে একতলার রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে এলো, সেই তার সন্ধানই সে পেল না।

কোন হদিসই সে করতে পারে না।

মাস চারেক মিনতির রতিকান্তর আশ্রয়েই কেটে গেল।

মল্লিকা ছোট বোনের [illegible] মিনতিকে [illegible], কোন দুঃখই তার এখানে নেই।

তারপর এক রাত্রে।

রতিকান্তদের শয়ন ঘরের পাশের ঘরটিতেই রাত্রে মিনতি শয়ন করতো।

সেদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল পাশের ঘরে রতিকান্ত ও মল্লিকার কথাবার্তায়।

এবং তাদের স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে তার নিজের নামটা হঠাৎ কানে যেতেই মিনতি যেন সচকিত হয়ে ওঠে।

সজাগ হয়ে কান পেতে শোনে।

স্পষ্ট শোনা যায় ওদের কথাবার্তা!

তোমাকে যে বলেছিলাম মীনুর স্বামীর খোঁজ করতে, তার কি করলে?

মল্লিকার প্রশ্নে রতিকান্ত জবাব দেয়, তোমার কি মাথা খারাপ হলো! সে আবার একটা বিয়ে—তার আবার স্বামী।

কি আবোল তাবোল বকছো!

হ্যাঁ, মীনু যার ওখানে থাকতো, ঐ যে সরোজিনী না কি নাম! সেটা তো একটা ডাক-সাইটে বেশ্যা!

বেশ্যা!

হ্যাঁ! খুব সম্ভবত প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে মীনু—ভিড়ের মধ্যে তার মার হাত থেকে ছিটকে ভিড়ের চাপে অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই সময় হয়তো ঐ ফুটফুটে মেয়েটিকে সরোজিনী দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে আসে। তারপর একটু বড়-সর হলে তারই বৃত্তিতে লাগিয়ে দিয়ে মোটা টাকা লাভের আশায় আশায় সে অপেক্ষা করে।

সে কি গো!

তাই! ওর সব কথা শুনলেই তো সব বোঝা যায়। বারবণিতাদেরও একটা আইন কানুন আছে। ব্যবসায় লাগানোর আগে ঐরকম একটা বিয়ের অনুষ্ঠান করে। কখনো কোন মানুষের সঙ্গে বিয়ে দেয় আবার কখনো মানুষ না পেলে একটা কলাগাছের সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেয় শুনেছি!

সত্যি বলছো!

হ্যাঁ—

তাহলে ওর কি হবে! ও যে সেই স্বামীকেই সত্যিকারের স্বামী ভেবে হেঁদিয়ে মরছে এখনো!

সে আর এসেছে। সে তার কাজ গুছিয়ে সরে পড়েছে। তাইতো বলছিলাম

মেয়েটা যখন আমাদের হাতে এসে পড়েছে, ওর একটা যা হোক হিল্লে আমাদেরই করে দেওয়া কর্তব্য নয় কি!

কি করবে শুনি? তা ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিলে কেমন হয়।

স্কুলে কলেজে পড়েতো একেবারে চতুর্বর্গ ফল লাভ হবে। তার চাইতে যদি একটু গান বাজনা, নাচ শিখতো তো দুটো পয়সা উপার্জন করতে পারতো।

তা বেশ, তাই না হয় ব্যবস্থা করে দাও। আহা, বেচারী! তাই বলে তোমার ঐ সব সিনেমা টিনেমায় কিন্তু নামতে দেবো না বলে রাখছি ওকে।

না, না—সিনেমায় নামবে কেন। গান বাজনা নাচ জানলে তো এমনিই কত রোজগার হয়।

আর পাশের ঘরে অন্ধকারে একাকী শয্যায় শুয়ে শুয়ে মিনতির সর্বাঙ্গ যেন পাথর হয়ে যায়।

বিয়েটা তার তাহ'লে বিয়েই নয়।

সমস্ত ব্যাপারটাই সে রাত্রে একটা ছেলেখেলা।

কিন্তু পুরোহিত তাহ'লে যে মন্ত্রোচ্চারণ করলো তাও অর্থহীন।

তাদের স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক সমাজ মেনে নেবে না।

কেমন যেন সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যায় মিনতির।

নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা তার দু চক্ষুর কোল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

সব। সব মিথ্যা! সব ফাঁকি!

না, না—এও কি কখনো সম্ভব!

তবে যে তিনি সে রাত্রে তার হাতদুটি ধরে বলেছিলেন, তুমি, তুমিই আমার স্ত্রী! আর কোন নারীই জেনো এ জীবনে আমার আসবে না।

সেও তাহ'লে মিথ্যা স্তোক।

মিথ্যা বলছেন তিনি।

পাশের ঘরে একসময় স্বামী স্ত্রীর আলাপ থেমে যায়।

ত্রিযামা রাত্রি উদয়দিগন্তে বিলীন হতে চলে।

মিনতির চোখে কিন্তু ঘুম আসে না।

ক্রমে অশ্রুও এক সময় যায় শুকিয়ে।

অশ্রুহীন দু'টি চক্ষু শুধু অন্ধকারে নির্নিমেষে একখানি ক্ষণ-পরিচিত মুখ খুঁজে খুঁজে ফিরতে থাকে।

পরের দিন মল্লিকা সকালে মিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। শুধু রাত্রি জাগরণ নয়, অশ্রুর চিহ্নও যেন ছড়িয়ে রয়েছে।

কি হয়েছে রে মীনু!

কই, কিছু হয়নি তো দিদি!

নিশ্চয়ই হয়েছে। আমার চোখকে তুই ফাঁকি দিবি ভেবেছিস! বল, কি হয়েছে।

সহসা অশ্রুবাষ্পে দুটি চক্ষু মিনতির ঝাপসা হয়ে যায় যেন।

মীনু!

আমার কি হবে দিদি!

কেন, কি আবার হবে!

সব। সব তোমাদের কথা কাল রাত্রে আমার কানে এসেছে দিদি! রতিবাবু যা বলেছেন সব তাহ'লে সত্যি! বিয়ে আমার হয়নি। সবই একটা ছেলেখেলা।

মল্লিকা প্রথমটায় যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

কি জবাব দেবে ভেবে পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, ভালই হলো, এ একপক্ষে বুঝি ভালই হলো। সত্যি কথাটা যা একদিন বলতেই হতো হতভাগিনীকে, দৈবক্রমে সবই তা সে জানতে পেরেছে। ভালই হলো।

একটা গুরুদায়িত্ব থেকে সে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল যেন।

সস্নেহে মল্লিকা মিনতিকে দুহা'ত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, এমন জগদ্ধাত্রীর মত রূপ নিয়ে জন্মেছিস, তোর কখনো খারাপ হবে না। আমি বলছি ভগবান তোর ভালই করবেন, তুই কিছু ভাবিস না।

তবু সান্ত্বনা পায় না মিনতি।

কেঁদে কেঁদে তার চোখ ফুলে যায়।

তার বিয়েটা মিথ্যা, তার স্বামী মিথ্যা, এ যেন ভাবতেই পারে না মিনতি।

তারপর মল্লিকাই একদিন বলে, এমনি করে বসে থাকবি কেন? তোর রতিবাবু বলছিলেন তুই গান-বাজনা-নাচ শেখ, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবি।

তা হয় না দিদি!

কেন! হয় না কেন?

না। তোমাদের উপর আর কত অত্যাচার করবো! আমার পথ আমিই দেখে নেবো।

মল্লিকা মিনতির কথায় সহসা রেগে ওঠে। বলে, সে তো নিশ্চয়ই, রূপ নিয়ে পাখা মেলবি তাই না—

তুমি আমাকে ভুল বুঝো না দিদি।

থাক। থাক—আর দিদি ডেকে সোহাগ দেখাতে হবে না। যা মরতে চাস যখন তাই যা তোর যেখানে খুশি!

দিদি, লক্ষ্মী দিদি শোন—

না, না—তোর কোন কথাই আমি শুনতে চাই না।

রাগে গড় গড় করতে করতে মল্লিকা ঘর ছেড়ে চলে যায়।

কি করবে মিনতি বুঝে পায় না।

কিন্তু সত্যিই তো। যাবো বললেই বা সে যাবে কোথায়? এ দুনিয়ায় কে তার আপনার জন আছে। কে তাকে আশ্রয় দেবে।

তার চাইতে গান বাজনা ও নাচ শিখে যদি সে তার পায়ে ভর দিয়ে নিজে দাঁড়াতে পারে সেটাই ভাল নয় কি।

দুদিন পরে মিনতি মল্লিকার সামনে গিয়ে ডাকে, দিদি!

মল্লিকা তরকারী কুটছিল, কোন সাড়া দেয় না।

রাগ করেছো দিদি।

তবু সাড়া দেয় না মল্লিকা।

বেশ তো তোমার কথাই শুনবো। ব্যবস্থা করে দাও, শিখবো গান-বাজনা।

সত্যি বলছিস।

হ্যাঁ!

কয়েক দিনের মধ্যেই রতিকান্ত উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দিল মিনতির গান-বাজনা ও নৃত্য শিখবার।

মিনতিও যেন প্রাণ ঢেলে দিল নাচ-গান ও বাজনার মধ্যে।

মিনতির গলায় গান শুনে মল্লিকা পর্যন্ত যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। কি মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ মিনতির।

সন্ধ্যার দিকে মিনতি যখন তানপুরা নিয়ে গান গায় ওস্তাদের সামনে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে সেই গান শোনে মল্লিকা।

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

মিনতির পায়ের তালে তালে ঘুঙুর যখন ঝুম ঝুম শব্দে বেজে ওঠে মল্লিকা দু'কান পেতে শোনে।

মেয়েটার এত রূপ এত গুণ তবু ভগবান কি ওর দিকে চোখ তুলে চাইবেন না।

কিন্তু মিনতি তখন বুঝি সব ভুলে গিয়েছে।

সমস্ত দুঃখ যেন তার সুরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

এতদিনে, এতদিনে সে যেন তাকে খুঁজে পেয়েছে।

১০

আরো চারটে বছর মিনতির জীবনে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত বসন্ত এলো এবং চলে গেল।

এবং সেই গত চার বছরের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর পার হয়ে কিশোরী মিনতি যৌবনে পা দেয়।

যৌবন ঢল ঢল দেহে রূপ যেন উছলে পড়ে মিনতির।

আর সেই সময়, এক সন্ধ্যায় মিনতি যখন তার ঘরের মধ্যে বসে আপন মনে তানপুরাটা নিয়ে গান গাইছে, রতিকান্তর গৃহে এলো ফিল্ম ডাইরেকটার সুকোমল চৌধুরী!

শুধু সুকোমল চৌধুরী নয় কুমার সুকোমল চৌধুরী।

মৌরীপুর স্টেটের কুমার।

বয়স আঠাশ উনত্রিশের মধ্যে। রোগা পাতলা চেহারা। প্রশস্ত উন্নত ললাট, মাথা ভর্তি বিস্রস্ত কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, খড়্গের মত উন্নত নাসা। দুটি চক্ষে বুদ্ধির প্রাখর্য!

দৃঢ় বদ্ধ ওষ্ঠ।

রাজবাড়ির ছেলেই শুধু নয়।

শরীরে যেন রাজকীয় আভিজাত্য স্পষ্ট।

দামী গাড়ি থেকে এসে নামলেন সুকোমল চৌধুরী।

ওষ্ঠে ধৃত দামী সিগারেট।

একদা রতিকান্তর সঙ্গে কলেজ জীবনে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেই বন্ধুত্বের

খাতিরেই বহুবার রতিকান্ত কুমারকে তার নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিন্তু কুমার আসেনি এতদিন।

অকস্মাৎ আজ এসে হাজির।

কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে মিনতির গানের সুর শুনেই যেন থমকে দাঁড়ায় কুমার সুকোমল।

এবং যতক্ষণ গান চলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।

তারপর ডাকে, রতিকান্ত!

কে?

কোথায় হে? আমি সুকোমল!

বাইরে বের হয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায় রতিকান্ত, আরে সুকোমল যে, এসো, এসো—কি সৌভাগ্য! অ্যাঁ, সত্যিই তাহলে তুমি এলে!

কিন্তু একটু আগে তোমার বাড়ির মধ্যে কে গান গাইছিল বলতো! গিন্নী নাকি!

আরে না, না—ও তো মিনতি!

মিনতি! হু ইজ সি?

বোস, বোস—রিয়েলি সি ইজ এ জুয়েল।

মল্লিকা সেদিন বাড়ি ছিল না ঐ সময়। তার বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল।

মিনতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে একপ্রকার জোর করে টেনে এনে কুমার সুকোমল চৌধুরীর সঙ্গে রতিকান্ত মিনতির আলাপ করিয়ে দিল।

এবং ঐ ঘটনারই দিন দুই পরে কুমার স্টুডিওতে ডেকে পাঠাল রতিকান্তকে।

কুমার তখন তার বইয়ের সুটিংয়ে ব্যস্ত ছিল।

রতিকান্তকে তার অফিসে বসতে বললে।

সুটিং শেষ হলে অফিস ঘরে এসে ঢুকলো কুমার সুকোমল।

তারপর, কি ব্যাপার, এত জরুরী তলব?

একটা প্রস্তাব আছে তোমার কাছে।

প্রস্তাব!

হ্যাঁ! সেদিন যে মেয়েটিকে তোমার ওখানে দেখলাম। ঐ যে মিনতি না কি—সে তোমার কে হয় বলতো!

কেন?

বলই না!

কোন রিলেশন নেই। বলে সংক্ষেপে মিনতির পরিচয়টা দিল রতিকান্ত।

আই সি! তা ওকে যদি আমার কম্পানীতে এক্সক্লুসিভ্ আর্টিস্ট করে নিই!

আপাততঃ পাঁচশ করে মাস মাস মাইনা দেবো। কি বলো রাজী আছো?

এ তো আনন্দের কথা। তবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ও মিনতির সঙ্গে একবার পরামর্শ করে তবে তোমাকে জানাবো।

বেশ। তাই জানিও। নেকস্ট্ বই আমার সামনের মাস থেকেই শুরু করবো। ওকে পেলে নায়িকার রোলটা আমি ওকেই দেবো।

তোমাকে আমি দু'একদিনের মধ্যেই জানাবো ভাই।

সেদিনকার মতো রতিকান্ত বিদায় নিয়ে চলে এলো।

বাড়ি ফিরে রতিকান্ত মিনতির সামনেই মল্লিকাকে কথাটা জানালো।

মল্লিকা শুনেই বলে—না, ও ফিল্মে নামবে না।

কিন্তু এবারে প্রতিবাদ জানায় মিনতিই।

সে বলে, কেন দিদি, এতে তুমি অমত করছো কেন! এমন একটা চান্স যখন এসেছেই—

থামতো তুই! ঝাঁঝিয়ে ওঠে মল্লিকা।

না, না—মল্লিকা, সত্যিই এ ব্যাপারে তুমি অমত করো না, রতিকান্ত বলে এ সুযোগ যখন মিনুর জীবনে এসেছেই। তাছাড়া কুমারের মত অমন বড় ডাইরেক্টার—দেখবে মিনু নিশ্চয়ই একদিন এ লাইনে সেনসেশান ক্রিয়েট করে দেবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—আরো দশজন যেমন এ লাইনে চমক লাগাচ্ছে—তাদেরই মতো ও যে কম চমক লাগাবে তা কি আমি জানি না। বলতে বলতে মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আসল কথা সন্তানহীনা মল্লিকা এই চারবৎসরে সত্যিই মিনতিকে ভালবেসেছিল।

আর সেই কারণেই আজ আর সে মিনতিকে ঐ লাইনে যেতে দিতে চায় না। ঐ লাইনের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সম্পর্কে অনেক কথাই যে অনেক সময় মল্লিকার কানে আসতো।

কিন্তু মিনতি তার জীবনের এতবড় সুযোগটা হারাতে চাইলো না।

স্বামী, স্বামীর ঘর, আজ সে সব স্বপ্নই কৈশোরত্তীর্ণ মিনতির মন থেকে মিলিয়ে গিয়েছে।

সেই মধুরাতটির কথা আর সেই একটি রাত্রের পরিচিত মানুষটির কথাও প্রায় তার স্মৃতিপট থেকে মুছে গিয়েছে।

নিষ্ঠুর বাস্তবের সামনে মুখোমুখি আজ সে দাঁড়িয়ে।

সংসারে আজ যখন আপনার জন কেউ নেই, তখন তার পক্ষে এমনি সুযোগটাকে অস্বীকার করবার মত বাতুলতা আর কি থাকতে পারে।

তাই মিনতি নিজেই মল্লিকাকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মল্লিকার সেই একই কথা।

ও লাইনে মিনতিকে সে যেতে দেবে না।

মিনতি বলে, তবে আমিই বা কি করবো বলো?

তোর আমি বিয়ে দেবো মিনু!

কি বললে! মিনতি চমকে উঠে বলে, বিয়ে! না দিদি, আর বিয়ে নয়। তাছাড়া বিয়ে তো আমার একবার হয়ে গিয়েছে—

সে আবার একটা বিয়ে নাকি!

সেটা অন্যের চোখে বিয়ে কিনা জানি না, তবে আমার স্বামী সেই।

অবাক বিস্ময়ে তাকায় মল্লিকা কথাটা শুনে মিনতির মুখের দিকে!

মিনু!

হ্যাঁ দিদি, বিয়ে আর আমার হতে পারে না। আর আমার ধারণা যে আজও তিনি বেঁচে আছেন। এবং তাঁর দেখাও একদিন আমি পাবোই। লক্ষ্মীটি, তুমি আর অমত করো না, চাকরিটা আমাকে নিতে দাও।

বেশ। তাহলে যা তোর মন চায় কর। আমি আর কি বলবো।

না, তোমাকে সন্তুষ্ট মনে মত দিতে হবে।

বললাম তো যা—

উহুঁ! ওরকম করে না। হাসি মুখে বলো—যা তুই!

বিরক্ত করিস না মিনু, যথেষ্ট ভাল মন্দ বুঝবার তোর বয়স হয়েছে। যা ভাল বুঝবি করবি!

বেশ, তাহলে সেইটুকু ভেবেই সম্মতি দাও দিদি।

মল্লিকা আর কোন জবাব দেয় না।

দু'হাতে মল্লিকাকে জড়িয়ে ধরে মিনতি বলে, ভয় নেই তোমার—একটি মাত্র পুরুষই জীবনে আমার এসেছে, সেই প্রথম ও সেই শেষ। এইটুকু মিনতির ওপরে তুমি বিশ্বাস রাখতে পারো।

১১

মিনতির জীবনের সেটা যেন চতুর্থ পর্যায়।

প্রথম জীবনটা কেটেছে মামার বাড়িতে এক গণ্ডগ্রামে, প্রতিটি দিন ও রাত্রি এক হতভাগিনী মুখ চোরা বিধবা মায়ের পাশে পাশে, দুঃখ, বেদনা, হতাশা ও অপমানের জ্বালায়।

তারপর সহসা এক নিশি রাত্রে উল্কার মতই ছিটকে সেই মৃত্যু আবেষ্টনীর থেকে বের হয়ে এলো।

এবং মা গেল সেই মুহূর্তে হারিয়ে চিরকালের মতই। এলো সরোজিনী আর সেই সঙ্গে গোপন কুৎসিত লালসার জাল বিস্তার।

জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়।

কাটলো আরো চারটি বছর।

সহসা আবার এলো একটি রাত। এবারও রাত বটে তবে অন্ধকার নয়।

শুধু আলো আর আলো।

কিন্তু এতো আলো, তবু যে কি কালঘুম দু'চোখের পাতায় নেমে এলো সে রাত্রে, ঘুম ভাঙতেই দেখলো সব শূন্য, সব ফাঁকি।

জীবনের সেই একটি আলো-ঝরা রাতের জ্যোতির্ময় পুরুষটি প্রভাতের আলোয় কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, মিলিয়ে গিয়েছে।

আবার জীবনের পৃষ্ঠা ওল্টালো মিনতি।

জীবনে এলো রতিকান্ত ও মল্লিকা।

এবং আরো চার বছর পরে এক সন্ধ্যায়, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটি বিরাট গেটওয়ালা, একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির গেট দিয়ে প্রবেশ করে সুসজ্জিত পার্লারে রতিকান্তর সঙ্গে গিয়ে প্রবেশ করলো মিনতি।

মৌরীপুর স্টেটের কুমার বাহাদুর সুকোমল চৌধুরীর কলকাতার বাড়ির চারিদিকে রাজকীয় রুচি আর আভিজাত্যের প্রকাশ।

গদী আঁটা সোফার ওপরে বসে দু'জনে অপেক্ষা করে।

একটু পরে কুমার সাহেব এসে ঘরে ঢুকলো।

পরিধানে পায়জামা ও হাইকলারের ঢোলা হাতা হাঁটু পর্যন্ত ঝুল পাঞ্জাবী, পায়ে চপ্পল। ওষ্ঠে ধরা দামী সিগারেট।

মাথার চুল তেমনি এলোমেলো তৈলহীন রুক্ষ্ম।

চোখে সেই অন্তর্ভেদী অথচ যেন নেশায় ঢুলু ঢুলু দৃষ্টি!

পুরুষের কণ্ঠস্বর জীবনে অনেক শুনেছে মিনতি কিন্তু কুমার সাহেবের মতো কণ্ঠস্বরের অমন বৈশিষ্ঠ্য জীবনে কমই সে শুনেছে।

সেই সন্ধ্যায়ই এগ্রিমেণ্ট্ সই হয়ে গেল চৌধুরী পিকচার্সের সঙ্গে আপাততঃ একবছরের এক্সক্লুসিভ্ আর্টিষ্ট হিসাবে এবং অগ্রিম ৫০১ টাকাও মিনতি পেল।

এবং সেই দিনই এগ্রিমেণ্ট্ করবার সময় কুমার সাহেব বললে, ফিল্মে মিনতি নামটা তার চলবে না।

তার নতুন নামকরণ করলো কুমার সাহেব—মিতা রায়।

এবং দিন সাতেক বাদে কাগজে কাগজে প্রথম বিজ্ঞপ্তি পড়লো।

চৌধুরী পিকচার্সের নবতম অবদান—বহ্নিশিখা।

প্রধান ভূমিকায় নবাগতা মিতা রায়।

জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে পা দিল মিনতি নয় মিতা রায়।

সুকোমল চৌধুরীর নিজস্ব স্টুডিওর ফ্লোর।

বিরাট হোটেলের অভ্যন্তরের একটি সেট্ পড়েছে।

একটা বিরাট গ্যাঙের দ্বারা বালিকা বয়সে অপহৃত একটি মেয়ে, যৌবনে আজ তার অসামান্য রূপ—সেই আজ দলের অন্যতমা নেত্রী।

অন্ধকার সমাজে স্বচ্ছন্দ-বিহরিনী সেই তরুণী আজ ঐ হোটেলে এসেছে আভিজাত্যর মুখোস এঁটে কোন একটি হতভাগা ধনী যুবকের সর্বনাশ সাধনে।

সেই দৃশ্যর-ই টেকিং।

সুটিং দেখতে আজ যারা সেটে উপস্থিত তারা অবাক বিস্ময়ে দেখছিল, অসামান্য রূপসী নবাগতা অভিনেত্রী মিতা রায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে।

টেকিংয়ের পূর্বে পাখীপড়ার মতই পড়িয়ে ও অভিনয় করিয়ে বুঝিয়ে দেয় পার্টটা কুমার সাহেব মিতাকে।

তারপরই কুমার সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, লাইট্ রেডি, ক্যামেরা রেডি, সাউণ্ড—

স্টুডিওর বাইরে সাউণ্ড ভ্যান থেকে সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ারের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, ও-কে!

সাইলেন্স প্লিজ! অল লাইটস্—

নিস্তব্ধ চারিদিক।

সুঁচ পতনের শব্দটিও বুঝি শোনা যায়।

প্রখর শক্তিশালী বিদ্যুৎ বাতির উত্তাপে যেন আগুনের হলকা ছড়ায়।

ক্ল্যাপস্টিকে সিকোয়েন্স, সিন নাম্বার, টেক নাম্বার ও বইয়ের নাম লিখে অ্যাসিসটেন্ট অ্যাডিটর ক্যামেরার সামনে এগিয়ে যায়।

স্টার্ট ক্যামেরা।

অ্যাসিসটেন্ট বলে, 'বহ্নিশিখা' সিন নাম্বার সিকস্‌টিন, টেক ওয়ান।

ক্যামেরা চলতে থাকে।

মিনিট চারেক বাদ ডাইরেকটার বলে, কাট! লাইটস্ অফ্।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার একটা অনুভূতি নিয়ে বাসায় ফিরে এলো মিতা।

সারাটা রাত মিতা দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। স্টুডিওর টেকিংয়ের সময় চোখ ঝলসানো আলো, ডাইরেকটার সুকোমল চৌধুরীর টুক্‌রো টুক্‌রো কথা, কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিচিত্র একটা স্তব্ধতা—সব কিছু যেন তার মনটা জুড়ে থাকে।

মল্লিকাদির ইচ্ছা ছিল না সে ফিল্মে নাম লেখায়, সে অভিনেত্রীর জীবন পেশা হিসাবে গ্রহণ করে।

কে জানে সে ভুল করলো কি না!

ভুলই করুক আর যাই করুক জীবনে এইখানে এসে আজ তার থেমে থাকলে চলবে না। এগিয়ে তাকে যেতেই হবে।

পশ্চাতের অন্ধকারে আর সে ফিরে তাকাবে না।

কোন সান্ত্বনা কোন স্মৃতিই আজ নেই তার ফেলে আসা জীবনের কোথায়ও।

শুধু অস্পষ্ট একখানি মুখ।

কিন্তু সে মুখও আজ তার ভুলতে হবে।

আর কেনই বা সে ভুলবে না।

সে যখন তাকে এমনি করে ত্যাগ করে চলে গেছে, একটিবার তার কথা ভাববারও প্রয়োজন বোধ করেনি, তখন সেই বা কেন তার স্মৃতি বুকের মধ্যে জিইয়ে রাখবে আজও।

কিন্তু আশ্চর্য!

কথাটা ভাবতে গিয়েও যেন বুকটার ভিতরে টনটন করে ওঠে কি এক ব্যথায়।

সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায় সমাজ ও তার নীতি ও আইনের বিরুদ্ধে।

কেন, কেন তার বিবাহটা সমাজ মেনে নেবে না।

কেন তার বিবাহটা ছেলেখেলা মাত্র।

সে তো সর্বান্তঃকরণেই সে রাতে তার স্বামীকে গ্রহণ করেছিল।

মন্ত্রর কি অর্থ তা সে জানে না। আর তার অর্থ দিয়েও কোন প্রয়োজন নেই তার, সেই মুহূর্তে তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যে মন্ত্র আপনা হতেই উচ্চারিত হয়ে উঠেছিল সে তো মিথ্যা নয়।

তার মধ্যে তো একটুকু ফাঁকীও সেদিন ছিল না তার দিক থেকে।

তবে কেন হবে তাদের বিবাহটা মিথ্যে! কেন হবে সবটাই একটা ছেলেখেলা। তাছাড়া তার স্বামী।

হ্যাঁ স্বামী বৈকি? তিনিও তো সে রাত্রে অকপটেই স্বীকার করেছিলেন জীবনে সেই তাঁর একমাত্র নারী।

আর অন্য কোন নারীই জীবনে তাঁর আসবে না। সেই তার স্ত্রী।

তবে কেন হবে সেদিনকার বিবাহটা তাদের মিথ্যে। ছেলেখেলা।

তবু মনের মধ্যে কোথায়ও কোন জোরই যেন পায় না মিতা। প্রচণ্ড একটা হাহাকারে বুকটা যেন গুমরে গুমরে উঠতে থাকে।

দিন আসে যায়।

স্টুডিও জীবনের বৈচিত্র্যের আস্বাদটা যেন থিতিয়ে আসে। এবং যত বইটা সমাপ্তির পথে এগিয়ে আসে, ততই যেন মনের মধ্যে একটা ভয়, একটা আশংকা দোলা দিতে থাকে।

কে জানে তার অভিনয় লোকে কি ভাবে নেবে।

এখানো পর্যন্ত কি সে করলো বা না করলো কিছুই বুঝতে পারেনি।

সুকোমল চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়েও কিছুই বুঝবার উপায় নেই।

অসম্ভব রকম গম্ভীর মানুষটা।

যেন একটা মেসিনের মতোই মনে হয়।

স্টুডিওর মধ্যে সকলেই অল্পবিস্তর গল্প করে তার সঙ্গে। ভাবও হয়েছে ইতিমধ্যে অনেকের সঙ্গে তার।

কেবল যেন আজও দূরের মানুষ থেকে গিয়েছে ঐ সুকোমল।

চৌধুরী। অদ্ভুত একটা আভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্যবোধে যেন সুকোমল চৌধুরীকে স্টুডিওর সবার থেকে চিহ্নিত করে রেখেছে সর্বদা।

রুক্ষ চুল, প্রশস্ত ললাট, বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চক্ষুর স্থির অনুসন্ধানী দৃষ্টি। উন্নত নাসা। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ। ধারালো চিবুক।

লোকটির মুখের দিকে তাকালেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভয় একসঙ্গে জাগে।

ওর শরীরের ধমনীতে যে রাজরক্ত প্রবাহিত সেটা যেন ওর সংযত কথাবার্তা চালচলন, হাসি চাউনি ও গাম্ভীর্য সব কিছুর ভিতর দিয়েই সুপ্রকাশ।

দীর্ঘ চার মাস একটানা সুটিং হবার পর সেদিন ঠিক প্যাক আপের পূর্ব মুহূর্তে সুকোমল চৌধুরী মিতার সামনে এসে দাঁড়ালো।

কেমন অভিনয় করলে ছবিতে দেখবে নাকি মিতা?

কেমন করে দেখবো! মিতা যেন অসহায় দৃষ্টি তুলে তাকালো সুকোমল চৌধুরীর মুখের দিকে।

এখুনি প্রজেকশনরুমে প্রথম পাঁচটা রীল প্রজেকশন করে দেখা হবে, দেখতে চাও তো দেখতে পারো।

নিশ্চয়ই দেখবো।

•

স্টুডিওর নিজস্ব প্রজেকশন রুম।

ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে প্রজেকশন শুরু হলো।

মিতার বুকের মধ্যে সে সময় কি এক অসহ্য কাঁপুনি। তার পাশেই বসে অন্ধকারে সুকোমল চৌধুরী।

এত কাছাকাছি সুকোমল চৌধুরীর কাছে কখনো মিতা বসেনি। আজ এই প্রথম।

অন্ধকার ঘরের মধ্যেও যেন মিতা লোকটির উপস্থিতি অনুভব করে।

অন্ধকারে সুকোমল চৌধুরীর জ্বলন্ত সিগ্রেটের রক্তাভ অগ্রভাগটা চুণির মত জ্বল জ্বল করে যেন জ্বলছে।

সিগারেটের গন্ধর সঙ্গে একটা পাতলা মিষ্টি সেন্টের গন্ধ মেশামেশি হয়ে ওর সমস্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যেন অবশ আচ্ছন্ন করে দেয়।

অবাক বিস্ময়ে অদূরস্থিত রূপালী পর্দার বুকে প্রতিফলিত সঞ্চরণশীল নিজের ছায়াটা দেখছিল মিতা।

বিশেষ করে যে সব দৃশ্যে সুকোমল চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে সে অভিনয় করেছে। গরীব আত্মভোলা চিত্রশিল্পীর ভূমিকায় নেমেছে সুকোমল চৌধুরী আর তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে সে।

ধনীর দুলালী, শিক্ষিতা, প্রগলভা, হৃদয় বলে সত্যিকারের কোন বস্তু নেই যার।

নেহাৎ খেয়ালে তার মোহের বশে একদিন যে ভালবাসার মালা দুলিয়ে দিয়েছিল শিল্পী অরূপের গলায়। আজ তার সেই ভুল বুঝি ভেঙে গিয়েছে, দারিদ্র আর অভাবে নিষ্ঠুর বাস্তব আঘাতে। মেজাজ তার আজ তাই রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

প্রতি পদে পদে আজ তাই সংঘাত।

অথচ মৌনী শিল্পীর সেজন্য কোন ক্ষোভ নেই।

রাগের মাথায় সেদিন প্রায় সমাপ্ত একখানি তৈল-চিত্র নিষ্ঠুর জিঘাংসায় নষ্ট করে দিয়েছে মীনা।

এ কি করলে মীনা, আমার এতদিনকার চেষ্টা এমনি করে তুমি নষ্ট করে দিলে?

ক্ষিপ্তা মীনা জবাব দেয়, বেশ করেছি, আগুন জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবো।

কিন্তু কেন! কেন তা তুমি করবে?

আমার ইচ্ছা, আমার খুশি! বলতে বলতে মীনা সামনের টেবিল থেকে পেন নাইফটা তুলে পাশের ক্যানভাসটার দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই অরূপ মীনার হাতটা চেপে ধরে বাধা দেয়।

বলে, না—

কিন্তু মীনা তখন যেন ক্ষেপে গিয়েছে। এক ঝটকা দিয়ে অরূপের মুঠি থেকে নিজের কব্জীটা ছাড়িয়ে নেয়। তারপর আবার এগিয়ে যেতেই বাঘের মতই যেন গর্জন করে ওঠে অরূপ, দাঁড়াও মীনা—

মীনা তথাপি কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। ছুটে গিয়ে ক্যানভাসটা হাতে তুলে নিতেই অরূপ ঝাঁপিয়ে পড়ে মীনাকে এক ধাক্কা দেয়। ছিটকে পড়ে যায় মীনা। এবং পড়ে যাবার সময় ত্রি'পয়ের ওপরে রক্ষিত রংয়ের জলের টামলারটা তার কপালে এসে পড়লো।

চিৎকার করে কেঁদে ওঠে মীনা।

রাস্কেল, ব্রুট্—

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো জ্বলে ওঠে।

প্রজেকশন ঐ পর্যন্তই।

প্রজেকশন শেষ হলো যখন, রাত নয়টা বাজে প্রায়।

১২

কুমারের বিরাট প্লিমাউথ গাড়িতেই ফিরছিল ওরা দুজনে স্টুডিও থেকে। পিছনের সীটে পাশাপাশি দু'জনে বসে। কারো মুখেই কোন কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে সুকোমল চৌধুরী মৃদু কণ্ঠে বললে, কেমন লাগলো নিজের ছবি তোমার।

আপনার কেমন লাগলো!

তোমার ভিতর অভিনয়ের স্পার্ক আছে মিতা। নিষ্ঠা রাখতে পারো যদি আমার মনে হয় একদিন স্বীকৃতি পাবে তুমি।

সবই আপনার কৃতিত্ব।

সব নয়, কিছুটা তোমারও আছে।

আর কোন কথা হয়নি সে রাত্রে ফিরতি পথে গাড়িতে।

সামান্য কিছু প্যাচ্ ওয়ার্ক বাকী ছিল।

সে কাজ যেদিন শেষ হলো সেদিন ফ্লোরে সুকোমল চৌধুরী উপস্থিত ছিল না।

তার অ্যাসিসটেন্ট্ অবনী মজুমদারই ডাইরেকশন দিচ্ছিল।

কাজ শেষ হবার পর বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে মিতাই অবনীকে জিজ্ঞাসা করলো, মিঃ চৌধুরীকে আজ ফ্লোরে দেখলাম না!

না, তিনি আসেন নি! কুমার সাহেব কয়দিন থেকে অসুস্থ।

অসুস্থ! কি হয়েছে?

তা জানি না। তবে শুনেছি সাত আট দিন বাড়ি থেকে বের হন না।

ফিরতি পথে ট্যাকসীতে বসে হঠাৎ মিতার মনে হয়, সুকোমল চৌধুরীর একটা খোঁজ নিতে যাওয়া তার উচিত। তাঁরই দয়ায় তার চাকরি। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়েও সে কোন খোঁজ খবর নেয়নি শুনলে হয়তো তিনি কিছু ভাবতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিতা ড্রাইভারকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যাবার জন্য নির্দেশ দিল।

কিন্তু নির্দিষ্ট বাড়িটার গেট দিয়ে ট্যাকসী প্রবেশ করে পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়াতেই মিতার ক্ষণ পূর্বের সমস্ত উৎসাহ যেন দপ্ করে সহসা নিভে যায়।

গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সী ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে দু'পা এগিয়ে গিয়েও পোর্টিকোর নিচে সে দাঁড়িয়ে যায়।

না ভেবে চিন্তে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ এখানে তার চলে আসাটা ভালো হলো কিনা কে জানে। মনে হয় ফিরেই যায় সে।

এগুতেও পারে না। পিছুতেও পারে না।

সে এক বিশ্রী অবস্থা।

সহসা ঐ সময় ড্রয়িংরুম থেকে একটি ভৃত্য পোর্টিকোয় এসে অন্ধকারে মিতাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রশ্ন করে—কে, ওখানে?

আমি।

খুট্ করে সুইচ টেপার শব্দ হয়। পোর্টিকোর আলোটা জ্বলে উঠ্লো।

কে আপনি! কাকে চান?

কুমার সাহেব আছেন?

আছেন কিন্তু—

তাঁকে একটু খবর দিতে পারো, স্টুডিও থেকে মিতা রায় এসেছে—

আপনি ভিতরে গিয়ে বসুন, খবর দিচ্ছি।

মিতাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে, ভৃত্য ভিতরে চলে গেল।

আবার মনে হয় মিতার, চলে গেলেই বোধ হয় ভাল হতো।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এতদূর এসে খবর দেবার পর চলে গেলে ব্যাপারটা বিশ্রী হবে।

একটু পরেই ভৃত্য এসে আহ্বান জানালো, আসুন—

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় একটা আলোকিত পর্দা ফেলা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, ইংগীত করে ভৃত্য বলে, যান ভিতরে।

বারেকের জন্য বুঝি মিতা ইতঃস্তত করে। তারপরই কম্পিত পদে পর্দা তুলে ঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে যায় মিতা।

দামী আসবাবপত্রে সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো।

একটা সোফার উপরে বসে সুকোমল চৌধুরী। সামনে একটা গোল টেবিলের উপরে ড্রিংকের সব সাজ সরঞ্জাম।

গায়ে কিমোনো সোফার উপর বসে সুকোমল চৌধুরী।

মাথায় চুল রুক্ষ।

কি খবর মিতা, এসো—

মিতা ঘরের মধ্যে এগিয়ে এলো।

পাশেই একটা শূন্য সোফা দেখিয়ে সুকোমল চৌধুরী পুনরায় সাদর আহ্বানে জানালো, এসো বোস—

ভীরু হরিণীর দৃষ্টি যেন ফুটে উঠে মিতার দু'চোখের তারায়। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় মিতা। এগিয়ে যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতেই আবার তাকায় মিতা সুকোমল চৌধুরীর দিকে।

এসো মিতা!

নরম কার্পেটের উপর পা ফেলে ফেলে সত্যি সত্যিই এবারে গিয়ে নির্দিষ্ট সোফার ওপর বসলো মিতা।

ঘামছে তখন তার সর্বাঙ্গ।

এ সে কি করলো। এখানে সে মরতে এলো কেন?

সহসা ঐ সময় ঘরের কোণে মিতার নজর পড়তেই দৃষ্টি তার যেন আর ফিরতে চায় না।

ট্যান করা বিরাট একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

চার পায়ে মুখ ব্যাদান করে এই দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখের কাচখণ্ড দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে আলোয়।

ও বাঘটা আমিই আসামের জঙ্গলে একবার শিকার করেছিলাম। ম্যান-ইটার— তিন তিনটে মানুষকে ও শেষ করেছিল।

নিজের অজ্ঞাতেই আবার সুকোমল চৌধুরীর চোখের সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলিত হলো।

আপনি বুঝি শিকার করেন?

এখন আর করিনা, তবে প্রথম যৌবনে করতাম। অনেক করেছি। মৃদু হেসে জবাব দিল সুকোমল চৌধুরী।

কথাটা বলে পাশের কলিং বেলটা টিপল চৌধুরী।

পূর্বোক্ত ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো।

চা নিয়ে আয়—

না, না—এখন চায়ের প্রয়োজন নেই।

তবে কি খাবে বলো! এনি কোল্ড্ ড্রিঙ্ক!

না।

একেবারে কিছুই খাবে না!

ভৃত্য তখনো অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। মিতা যেন কেমন বিব্রত বোধ করে। ভৃত্যের দিকে চেয়ে বলে, কিছুর দরকার নেই, যাও।

ভৃত্য চলে গেল।

আমাদের এ বইটা সামনের মাসেই রিলিজ হচ্ছে, শুনেছো বোধ হয়।

না তো!

হ্যাঁ, আমাদের নেক্সট্ প্রোডাকশন সামনের মাসের গোড়াতেই শুরু হবে। অবনীকে আমি বলে দিয়েছি স্ক্রিপ্টটা তোমাকে একবার এর মধ্যে শুনিয়ে দিতে।

এবারেও বুঝি গল্প আপনারই লেখা!

না। একজন অনামা নতুন লেখকের লেখা গল্প। দু চারটে গল্প মাত্র বের হয়েছে এদিক্ ওদিক মাসিক ও সাপ্তাহিকে। তারই একটা গল্প আমি কিনেছি।

ঐ সময় সহসা চুড়ির মৃদু শব্দে চোখ তুলে তাকাতেই মিতার অপূর্ব সুন্দরী এক ২৫/২৬ বৎসর বয়স্কা নারীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো।

পরিধানে দামী শাড়ী, গা ভর্তি গহনা।

দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে।

কি চাও রমা!

ইনি কে?

ও মিতা রায়, আমার বইয়ের নতুন হিরোয়িন। মিতা এ আমার স্ত্রী রমলা!

মিতা হাত তুলে নমস্কার জানাল কুমারের স্ত্রীকে।

এবং এতক্ষণে সর্বপ্রথম যেন এ বাড়িতে পা দেওয়া অবধি, মিতা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

বুকের ভিতরটা যেন হালকা বোধ করে।

কুমার সাহেবের স্ত্রী কেন ঘরের মধ্যে দাঁড়ালো না। পরক্ষণেই তীব্র দৃষ্টিতে বারেক মাত্র মিতার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল, মিতার নমস্কারের কোন প্রত্যুত্তর বা স্বীকৃতি না দিয়েই।

মিতা যেন কেমন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

উনি চলে গেলেন কেন?

ওর কথা বলো না মিতা, ওর না আছে কোন কালচার না আছে কোন শিক্ষা।

আমি তা'হলে এবার উঠি—

উঠবে? কিন্তু কেন এসেছিলে তা তো বললে না!

না সে তেমন কিছু নয়। অবনীবাবুর মুখে শুনলাম আপনি অসুস্থ তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম। বলতে বলতে মিতা ততক্ষণে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

চপ্পলটা পায়ে গলাতে গলাতে সুকোমল চৌধুরীও উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—

না, না—তার কোন প্রয়োজন হবে না। নিচে ট্যাক্সী আমি দাঁড় করিয়েই রেখেছি, চলে যেতে পারবো।

তা হোক। ট্যাক্সী ছেড়ে দেবে চল, আমিই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো! তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি।

মিতাকে কোনরূপ প্রত্যুত্তরের অবকাশ মাত্রও না দিয়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে সুকোমল চৌধুরী।

মিতা আবার সোফার ওপর বসে পড়ে।

সোফায় বসে অন্যমনস্ক মিতা সুকোমল চৌধুরীর স্ত্রী রমলা দেবীর কথাই ভাবছিল।

ভদ্রমহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকেই তার নমস্কার করা সত্ত্বেও কোন প্রতিনমস্কার না জানিয়েই অমন করে বের হয়ে গেলেন কেন ঘর থেকে।

কেন তুমি এসেছো এখানে?

সহসা ঠিক পিছনেই ক্ষণমুহূর্তে শ্রুত নারীকণ্ঠ শুনে যেন ভূত দেখার মতই চম্‌কে ফিরে তাকায় মিতা।

ঠিক তার সোফার পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে রমলা!

কখন যে সে তার সোফার পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি সে।

চোখ তো নয় দুখণ্ড অঙ্গারের মতই জ্বলছে রমলার চোখের মণি দুটো যেন।

ভেবেছো ও তোমাকে মাথায় করে নাচবে, তাই না! ভুল! ভুল করেছো তাহ'লে। সখ মিটে গেলেই তোমাকে ও ঠেলে সরিয়ে দেবে! চিনতেও তখন পারবে না—কথাগুলো বলেই আর দাঁড়ালো না রমলা, ঘর থেকে বের হয়ে গেল অন্য দ্বারপথে।

স্তম্ভিত মিতা পাথরের মতই যেন জমাট বেঁধে সোফার উপর বসে থাকে।

তারও মিনিট দুই বাদে ঘরে এসে ঢুকলো সুকোমল চৌধুরী।

পায়জামার উপরে একটা পাঞ্জাবী চাপিয়ে এসেছে মাত্র।

চল মিতা।

যান্ত্রিক পুতুলের মতই উঠে দাঁড়ালো মিতা।

বাড়িতে ফিরতে সে দিন একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল মিতার।

এবং দরজার গোড়াতে মিতাকে নামিয়ে দিয়েই চলে গিয়েছিল সুকোমল চৌধুরী।

তারপর মাসখানেক আর দেখা হয়নি মিতার সঙ্গে সুকোমল চৌধুরীর।

সংবাদপত্র মারফত-ই জেনেছিল মিতা, সুকোমল চৌধুরী তাঁর পরবর্তী বইয়ের লোকেশনের জন্য মণিপুর অঞ্চলে গিয়েছে।

ওদিকে যথা সময়ে মিতার প্রথম বই হাউসে রিলিজ হলো।

এবং বই রিলিজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিতা যেন বেশ কিছুটা জনগণের চিত্ত জয় করে নিল।

চারিদিকে কাগজে মিতাকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হলো। চিত্রজগতের নবোদিত তারকা মিতা রায়। তার মধ্যে আছে নাকি প্রচুর সম্ভাবনার ইঙ্গিত।

হাউসে বই রিলিজ হবার হপ্তা দুই পরে একদিন দ্বিপ্রহরে স্টুডিয়োর গাড়ি এলো মিতাকে নিতে।

১৩

মল্লিকার পাশে শুয়ে মিতা মল্লিকার সঙ্গে গল্প করছিল। এমন সময় ভৃত্য এসে জানাল, স্টুডিও থেকে গাড়ি এসেছে মিতাকে নিয়ে যেতে।

একুট যেন বিস্মিত হয়েই মিতা ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে জানতে পারলো, ডিরেকটার সাহেব নিজে তার গাড়ি পাঠিয়েছেন। হয়তো নতুন বই সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই সুকোমল চৌধুরী ডেকে পাঠিয়েছেন। তাড়াতাড়ি সাজ গোজ করে মিতা প্রস্তুত হয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলো।

সুকোমল চৌধুরী বলেছিল বটে তার অ্যাসিস্‌টেন্ট ইতিমধ্যে একদিন এসে নতুন বইয়ের স্ক্রিপ্টটা শুনিয়ে যাবে। কিন্তু অবনী আসেনি।

মিতা এখনো জানে না পরবর্তী বইয়ে তার কি ধরনের রোল। কাগজে অবিশ্যি বিজ্ঞাপন দেখেছিল মিতা, সুকোমল চৌধুরী শীঘ্রই তার নতুন বই শুরু করবেন। কিন্তু মিতা একটু আশ্চর্যই হয় যখন পরিচিত স্টুডিওর বদলে অন্য স্টুডিওতে এসে গাড়ি ঢুকছে।

সে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে, এ কোন স্টুডিওতে এলে ড্রাইভার?

ড্রাইভার জবাব দেয়, সাহেব এখানেই আছেন।

নতুন স্টুডিও।

গাড়ি থেকে নামতেই সুকোমল চৌধুরীর অ্যাসিস্‌ণ্টেট অবনী এগিয়ে এলো, আসুন মিস্ রয়, মিঃ চৌধুরী ডাইরেক্টরস রুমে আছেন।

লম্বা ব্যারাকের মত রাস্তার ডানদিকে পর পর সব ছোট ছোট ঘর। স্টুডিওতে বর্তমানে যে যে ডাইরেকটার কাজ করছেন তাদের জন্য প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। ঘরের দরজায় নেমপ্লেটে ডাইরেকটারের নাম লেখা ও বইয়ের নাম।

অবনীর সঙ্গে একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটিতে গিয়ে প্রবেশ করলো মিতা পর্দা তুলে। ঘরের মধ্যস্থলে একটি টেবিল। ঘরের দরজার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছিল সুকোমল চৌধুরী। তার পাশে দুটো চেয়ার দু-জন মধ্যবয়েসী অজানা ভদ্রলোক বসে। এক-জনের বেশভূষা দেখলেই বোঝা যায় তিনি মাড়োয়ারী। অন্যজনের পরিধানেও দামী সুট।

মিতা ঘরে প্রবেশ করতেই একটা খালি চেয়ার নির্দেশ করে কুমার সাহেব তার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বললে, বোস মিতা।

নমস্তে, মিতা দেবী!

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক নমস্কার জানালো।

নমস্তে। মৃদুকণ্ঠে মিতা জবাব দেয় চেয়ারে বসতে বসতে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিও নমস্কার জানালো।

এবার সুকোমল চৌধুরীই কথা বলে—মিতা, ইনি হচ্ছেন রামদাস চামেরীয়া। এঁর সঙ্গেই আমি আমার পরবর্তী বইয়ের কনট্রাকট সই করেছি। এদের ইচ্ছা তুমিই ওদের বইতে হিরোয়িন থাকো। আমার বইতে যে রেমিউনারেশন পেয়েছ এঁরা তাই দেবেন।

মিঃ চামেরীয়া তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে ওঠেন, চৌধুরী সাবকে দিয়ে আমার আরো দুটো বই করবো। সব বইতে আপনি থাকবেন। তিনটি বইয়ের জন্যই আপনার সঙ্গে আজ আমরা কনট্রাকটি সই করিয়ে নিতে চাই—

তিন তিনটে বইয়ের এক সঙ্গে কনট্রাক্‌ট্—

বিহ্বল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায় মিতা সুকোমল চৌধুরীর দিকে।

কি জবাব দেবে সে ভেবে পায় না।

সহসা সুকোমল চৌধুরী কথা বলে উঠে, না মিঃ চামেরীয়া, তিনটে বইয়ের একত্রে কনট্রাকট হবে না। মাত্র একটি বইয়ের জন্যই আপাততঃ উনি কনট্রাকট করবেন। সেই মতই কনট্রাকট সই করিয়ে নিন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি এবার কথা বললেন, আমরা মিতাদেবীকে একসক্লুসিভ আর্টিস্ট করে নিতে চাই তিন বছরের জন্য। সেজন্য উনি কি মাইনা মাস মাস একস্‌পেকট্ করেন তাই না হয় বলুন না।

বেশ তো উনি যদি তাতে রাজী থাকেন তো সই করুন। কুমার সাহেব এবার বলে।

মিতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়, না, কুমার সাহেব যা বলেছেন তাই হবে। আমি একটা বইয়ের জন্যই সই করবো।

অতঃপর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক, তার বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে চোখ চাওয়া চাওয়ি করে বললেন—বেশ, তবে তাই হোক।

হাজার এক টাকা নগদ দিয়ে মাস মাস ৫০০ শত টাকা মাইনা হিসাবে তখুনি কন্ট্রাক্ট্ সই হয়ে গেল।

কন্ট্রাক্ট্ সই হতে হতে ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

সুকোমল চৌধুরী মিতাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তার গাড়িতে উঠলো। পাশাপাশি দুজনে বসে।

চল আমার বাড়ি থেকে চা খেয়ে যাবে।

কুমার সাহেবের বাড়িতে যাবার কথায় মিতার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ওর স্ত্রী রমলা দেবীর কথা এবং মনটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তবু কেন না জানি কোন প্রতিবাদ জানাতে পারে না কুমারের প্রস্তাবে।

প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে কুমার সাহেবেরই সহায়তায় চিত্রজগতে তার পরিচিতির এই শুভক্ষণে মনে যেন তার কুমার সাহেবকে না বলতে সংকোচ হয়।

কিন্তু ঐ সঙ্গে সেদিনকার ক্ষণ-পরিচিত রমলা দেবীর কথাগুলোও যেন সে ভুলতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হয়, এই কয় মাসের আলাপে আজ পর্যন্ত সে কুমারের দিক থেকে কোন অসংগত আচরণ বা অসৌজন্যের আভাষ মাত্রও দেখেনি। সেদিক থেকেও তো তার কুমারের বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই। তাই কুমারের প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না কিছুই বলে না মিতা।

দোতালায় কুমার সাহেবের সেই পরিচিত ঘর। শুধু তফাতের মধ্যে আজ কুমারের সামনে মদের বোতল বা গ্লাস ছিল না। ট্রের ওপরে সাজানো ছিল চায়ের সাজ সরঞ্জাম।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সুকোমল চৌধুরী বলছিল, একটা কথা তোমাকে আজ বলছি মিতা, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এ লাইনে স্বীকৃতি পেতে দেরি হয় না। তাছাড়া তোমার মধ্যে যে অভিনয়ের স্পার্ক আছে তাতে করে সে স্বীকৃতি পেতে তোমার হয়ত খুব কষ্ট হবে না। কিন্তু মনে রেখো, সে স্বীকৃতি নষ্ট হতেও বেশি দেরি হয় না।

মিতা কোন জবাব দেয় না, চুপ করেই থাকে।

তাই বলছিলাম, কুমার বলতে থাকে, সেই স্বীকৃতি আসবার মূলে কখনো বেসামাল হয়ো না। তাছাড়া আরো একটা কথা মনে রেখো, পর্দায় বলো, মঞ্চে বলো, অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্বীকৃতিটা জনগণের কাছ থেকে যেমন আচমকা উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে তেমনি আচমকাই আবার একদিন তাঁরা মুখ ফিরিয়েও

নিতে পারে। আরো ঐ সঙ্গে একটা কথা মনে রেখো মিতা এই লাইনে সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই!

কথায় কথায় সেদিন রাত দশটা হয়ে গিয়েছিল। মিতার খেয়ালই ছিল না।

আচমকা হাত ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় খেয়াল হতেই মিতা চম্‌কে ওঠে রাত দশটা, এবার আমি বাড়ি যাবো মিঃ চৌধুরী।

হ্যাঁ, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কুমার সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং ভৃত্যকে ডেকে আদেশ দিলেন ড্রাইভারকে গাড়ি বের করবার জন্য।

ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। পিছনের সীটে পাশাপাশি বসেছিল মিতা আর কুমার সাহেব! নিঃশব্দে এক সময় অন্ধকারেই কুমার সাহেব মিতার হাতটা স্পর্শ করলো!

প্রথমটা মিতা ঠিক বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা।

ভেবেছিল হয়তো পার্শ্বে উপবিষ্ট কুমারের হাতটা এমনিই তাকে স্পর্শ করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার সে ভুল ভেঙে গেল যখন কুমার তার হাতটা ধরে নিজের কোলের উপর তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে মিতা হাতটা টেনে নেয় কারণ পুরুষের স্পর্শের মধ্যে কোথায় আছে শংকা, নারী হয়ে সেই মুহূর্তে মিতার বুঝতে দেরি হয়নি।

এবং অজানিত একটা ভয়ে ঐ মুহূর্তে বুকের ভিতরটাও যে দূর দুর করে কেঁপে ওঠেনি তাও নয়।

তবু আশ্চর্য, মিতা এতটুকু শব্দ করেনি।

গাড়ির জানালা পথে প্রচুর হাওয়া আসলেও ঘামছিল মিতা।

কুমার এবারে অসংকোচেই মিতার টেনে নেওয়া হাতটা চেপে ধরলো।

মিতা!

বলুন।

আমি এবারে তোমার সঙ্গে চার বছরের একটা লঙ্‌ কনট্রাক্ট্‌ করবো ভাবছি।

হাতটা ছাড়ুন কুমার সাহেব!

কেন, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না!

বিশ্বাস যদি আপনি রাখতে পারেন তো কেন করবো না আপনাকে বিশ্বাস!

গাড়িটা ঐ সময় ধীরে ধীরে থেমে গেল!

মিতার বাড়ি পৌঁছে গিয়েছে।

হাতটা ছেড়ে দিল কুমার।

মৃদু কণ্ঠে নমস্কার জানিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল মিতা।

কুমার সাহেবের দ্বিতীয় চিত্রের সুটিং যথা সময়ে শুরু হলো।

এবং যত সুটিং এগিয়ে যেতে লাগলো মিতা লক্ষ্য করলো, আসলে সে বইয়ের নায়িকা থাকলেও স্ক্রিপ্টে গল্পের গতি কুমার সাহেব এমনি অদল বদল করে দিয়েছেন যে, নায়িকার ভূমিকা থেকে সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে পড়ে উপনায়িকার উপরেই। এবং মিতা বুঝতে পারে ইচ্ছা করেই কুমার সাহেব ছবির নায়িকাকে কোন ঠাসা করে উপনায়িকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন গল্পে।

রুদ্ধ আক্রোশে ভিতরে ভিতরে মিতা ফুলতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই! সামান্য দিনেই সে বুঝতে পেরেছে ছবির ডাইরেকটারই সর্বেসর্বা। তার ইচ্ছা ও খেয়াল খুসিতেই ছবি।

এ ক্ষেত্রে কিছু বলতে যাওয়া মানেই অপমানিত হওয়া।

এ যে তার সেদিনকার গাড়ির মধ্যে কুমারের প্রতি ব্যবহারেরই প্রতিক্রিয়া সেটুকু বুঝতেও মিতার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের দেরি হয় না।

উপায় নেই।

কনট্রাকট্ যখন সে সই করেছে ছবি তাকে শেষ করতেই হবে ছবিতে সে স্বীকৃতি পাক বা না পাক।

তা ছাড়া এ লাইনেও সে নবাগতা।

এই তার দ্বিতীয় ছবি। সে ক্ষেত্রে কুমার সাহেবের মত একজন স্বনামধন্য ডাইরেকটারের বিরুদ্ধে যাবার কথা কল্পনাতেও ভাবতে পারে না।

ভাগ্যের উপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে মিতা চুপ করেই থাকে।

এবং যথাসাধ্য সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মত অভিনয় করবার চেষ্টা করে যায়।

প্রথম ছবিতে কুমার সাহেব তাকে পাখী পড়ার মতো করে বুঝিয়ে বুঝিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন আর এবারে মিতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, উদাসীন যেন।

মিতার প্রতি কুমার সাহেবের ঈদৃশ আচরণ কুমারের সহকারী অন্যান্য কর্মীদের কারোরই দৃষ্টি এড়ায় না।

তারাও কম বিস্মিত হয় না।

এমন কি কুমার সাহেবের অ্যাসিস্‌টেন্ট অবনী একদিন সুটিংয়ের অবসরে কথাটা কুমার সাহেবকে বলেওছিল।

কুমার জবাবে বলেছিলেন, তাতে করে ভস্মে ঘি ঢালাই হবে অবনী, ওর কোন পার্টস আছে বলে আমার মনে হয় না।

অল্প দূরেই ঐ সময় একটা চেয়ারে ফ্লোরেই একপাশে মিতা বসেছিল মেক আপ নিয়ে, কথাটা তার কানে যায়।

কুমারের কথায় মিতার দু'চক্ষু বেয়ে সেদিন দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল চিৎকার করে সে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—স্কাউণ্ড্রেল, লম্পট—

কিন্তু গলা দিয়ে তার স্বর বের হয় না।

ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে কেবল চোখের কোঁন বেয়ে পড়তে থাকে।

১৪

যথা সময়ে দ্বিতীয় ছবি একদিন হাউসে রিলিজ হলো।

কিন্তু মনে মনে যা সে ভয় করেছিল তাই হলো।

ছবির সমস্ত কৃতিত্ব পেল উপনায়িকাই।

কোন কাগজেই এবারে সমালোচকরা মিতা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বললো না। কেবল একটা অখ্যাতনামা কাগজে ছবিতে নায়িকাকে কোণঠাসা করা সত্ত্বেও এবং তার দেখাবার কিছু না থাকা সত্ত্বেও সে যে জায়গায় জায়গায় তার অপূর্ব অভিনয় প্রতিভার নিদর্শন দেখিয়েছে সে কথা লিখলো।

কিন্তু তাতে করে বিশেষ কোন ফল হলো না।

দ্বিতীয় ছবির জন্য তার পূর্ব কনট্রাকট থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ছবিতে কুমার সাহেব তাকে নিল না।

ছয় মাস চুপ চাপ বসে রইলো মিতা।

হাতে কোন কাজ নেই।

নিশ্চিন্ত একটানা অবসরে মিতা যখন প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছে, নবাগত এক তরুণ পরিচালক গোষ্ঠি একদিন দ্বিপ্রহরে এসে তাদের ছবিতে মিতাকে কাজ করবার জন্য অনুরোধ জানালো। ভদ্রলোকেরা স্পষ্টই বললেন, টাকা তারা বিশেষ কিছু দিতে পারবেন না। সামান্যই দেবেন। কিন্তু গল্পটা শুনে মিতার চরিত্রটি এত পছন্দ হয়ে গেল যে সে ঐ সামান্য টাকাতেই কনট্রাকট সই করে দিল।

পরিচালক গোষ্ঠিতে তিনজন তরুণ কর্মী ছিল। তাদের অনন্য সাধারণ

অধ্যবসায়, প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় সত্যিই মিতা যেন মুগ্ধ হয়ে যায়। মিতার বিপরীতে যে তরুণ সুদর্শন অভিনেতাটি অভিনয় করছিল, ছবিতে সে একেবারে নবাগত না হলেও ছবির বাজারে তার তখনো বিশেষ কোন নাম হয়নি। নাম তার কুমারকৃষ্ণ।

মিতা তার বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে সত্যিই ভারী আনন্দ পায়।

ছবি একদিন শেষও হলো। কিন্তু নতুন নায়ক নায়িকাকে নিয়ে ছবি এবং ডাইরেকটার গোষ্ঠিও নতুন চিত্রগৃহের মালিকরা ছবির বুকিংয়ের ব্যাপারে নানা রকম টাল বাহানা শুরু করে দেয়। তারিখ তারা দিতে চায় না।

আসামের জংগলের পটভূমিকায় ঐ সময় কুমার সাহেবের নতুন একখানি ছবি তখন ছবির বাজারকে রীতিমত গরম করে রেখেছে।

কুমার সাহেব পরিচালিত ও অভিনীত 'জংগল' ছবিটির কথা যেন লোকের মুখে মুখে। শহরের সর্বত্র দেওয়ালে দেওয়ালে 'জংগলে'র পোস্টার পড়েছে।

শেষ পর্যন্ত একই দিনে 'জংগল' ছবির সঙ্গে বিভিন্ন চিত্রগৃহে মিতা ও কৃষ্ণকুমার অভিনীত 'চাওয়া না চাওয়া' ছবিটি রিলিজ হলো।

যে চিত্রগৃহে 'জংগল' ছবিটি রিলিজ হলো সেখানে দর্শকদের ভিড়ে পা ফেলবার জায়গা নেই। আর যে চিত্রগৃহে 'চাওয়া না চাওয়া' রিলিজ হলো সে চিত্রগৃহ একেবারে খালি। নতুন পরিচালক গোষ্ঠি, নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী কারো সেদিকে দৃষ্টিই নেই। কিন্তু দিন দশেক যেতে না যেতেই সহসা যেন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

'জংগল'কে ছাপিয়ে গেল 'চাওয়া না চাওয়া'র বিক্রি।

এবং একাধিক্রমে পঞ্চাশ সপ্তাহ 'চাওয়া না চাওয়া' চলে চিত্রজগতে একটা যুগান্তকারী রেকর্ডের সৃষ্টি করলো।

কাগজে কাগজে মিতা ও কৃষ্ণকুমারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো।

রোমান্টিক এমন জুড়ি নাকি আর হয় না!

পর পর আরো দুখানি কৃষ্ণকুমার ও মিতা অভিনীত ছবি চিত্রজগতে প্রচুর পয়সা দিয়ে সাড়া জাগিয়ে তুললো।

শুধু মিতাই নয় কৃষ্ণকুমারও চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে অর্থ আসতে শুরু হলো যেন বন্যার মত।

সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মিতা তার চাহিদা অনুযায়ী পারিশ্রমিকের অঙ্কটা বাড়িয়ে চললো।

মিতার সাফল্যে সর্বাপেক্ষা আনন্দ যেন রতিকান্তর।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে বলে, এ আমি জানতাম, মিতা একদিন চিত্রজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ তারকা হবে।

কিন্তু রতিকান্তর মত আনন্দিতা হয়নি মল্লিকা।

অর্থ ও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মিতার মধ্যে যে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছিল রতিকান্তর চোখে সেটা না পড়লেও মল্লিকার চোখের দৃষ্টিতে সেটা ফাঁকি দিতে পারেনি।

পর পর কয়েকখানি ছবি কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে অভিনয় করে অলক্ষ্যে মিতার মনে যে ক্রমশঃ একটু একটু করে কৃষ্ণকুমারের প্রতি আকর্ষণ জন্মাচ্ছিল সেটা মল্লিকার দৃষ্টিকে এড়ায়নি।

প্রায়ই কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে এদিক ওদিক যাওয়া, দুজনে একত্রে কখনো রেঁস্তোরায়, কখনো সিনেমায়, কখনো ক্লাবে বা পার্টিতে মিতার ব্যাপারটা প্রথম থেকেই মল্লিকা সুনজরে দেখতে পারেনি।

সুটিং থাকলে তো কথাই নেই, অন্যদিনও প্রায় রাত করে মিতা বাড়িতে ফিরতে শুরু করলো।

এবং শুধু কৃষ্ণকুমারই নয় ঐ সঙ্গে আরো দু'চারজন করে পুরুষ বন্ধু এসে তার চারপাশে ভিড় করতে লাগলো যখন, তখন একদিন মল্লিকা মিতাকে কথাটা না বলে পারল না।

বলে, কি শুরু করেছিস বলতে পারিস মীনু?

সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে মিতা ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে গুণ গুণ করে একটা গান গাইতে গাইতে শয়নের পুর্বে কেশ প্রসাধন করছিল একটা সাদা চিরুণী দিয়ে।

মল্লিকার আকস্মিক প্রশ্নে ঘাড় বেঁকিয়ে সহাস্য মুখে তাকালো মিতা। এবং হাস্যস্ফুরিত ওষ্ঠে বললে, কেন কি আবার হলো!

কচি খুকীটি আজ আর তুই নোস মীনু! আমার কথাটা না বুঝবার মত বয়স তোর নয়।

আহা, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি দিদি—কি হলো?

ভুলিস না হতভাগী তুই শুধু মেয়েমানুষই নোস, গা ভর্তি তোর চোখ ঝলসানো রূপ রয়েছে—

উঠে আসে মিতা। এবং দু'হাতে আদর করে মল্লিকার গলাটা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে—

রূপ লাগি' আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি' কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

সরে যা হতভাগী, ভাল হবে না বলছি—

কৃত্রিম রোষে দু'হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দিয়ে মিতাকে মল্লিকা।

মিতা পুনরায় দুহাত দিয়ে মল্লিকাকে আরো নিবিড় করে এবারে আঁকড়ে ধরে পূর্ব্ববৎ গেয়ে চলে—

হিয়ার পরশ লাগি' হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ-পুতুলি মোর স্থির নাহি বান্ধে॥

রাগ করছিস দিদি! ভয় নেই রে ভয় নেই, ও জাতটাকে আমি ভাল করেই চিনে নিয়েছি। মরতে হয় ওরাই মরবে, আমি মরবো না বুঝলি?

থাক, থাক—আর বড়াই করিস না। সরোষে বলে ওঠে মল্লিকা, মুনি ঋষিরও মতিচ্ছন্ন হয় তা তুই তো অল্প বয়সের একটা মেয়ে। কিন্তু এ আমি সহ্য করবো না মীনু জেনে রাখিস! .

কৌতুকভরা দৃষ্টিতে মল্লিকার দিকে চেয়ে বলে মিতা, কি করবি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিবি?

শুধু তাড়িয়ে নয়, দরকার হয় তো ঝেঁটিয়ে বের করে দেবো বাড়ি থেকে।

পারবে!

খুব পারবো। পারবো না আবার! বলে রাগে গর গর করতে করতে মল্লিকা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

কথাটা যে মল্লিকা মিথ্যা বলেনি, কথার মধ্যে যে তার এতটুকুও অতিশয়োক্তি ছিল না সেটা প্রমাণ হতে দেরি হয় না।

প্রথম যেদিন মদ্যপান করে রাত্রে মিতা বাড়িতে এসে ঢুকলো মল্লিকা যেন একেবারে পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

টলতে টলতে অসংবৃত পদবিক্ষেপে মিতা শয়ন ঘরের দিকে এগুচ্ছিল, তীক্ষ্ণ অনুচ্চ-কণ্ঠে মল্লিকা ডাকলো, মীনু!

কি? ঈষৎ মুদ্রিত আঁখির দৃষ্টি নিয়ে ফিরে দাঁড়ালো মিতা মল্লিকার মুখের দিকে।

তুই—তুই মদ খেয়েছিস?

খুব বেশি না, Just two ছোটা পেগস্—

ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি দিয়ে মরগে যা!

কোন দুঃখে' বলেই আপন মনে মিতা গুণ গুণিয়ে ওঠে—

জীবনের যে ক'টা দিন কাটিয়ে যাবো প্রিয়ে,
সঙ্গে রবে সুরার পাত্র,
অল্প কিছু আহার মাত্র
আর একখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে।

বলতে বলতে টলে পড়ে যাচ্ছিল মিতা। তাড়াতাড়ি মল্লিকা গিয়ে তাকে ধরে ফেললো।

সযত্নে ধরে, মিতাকে অতঃপর শয্যায় শুইয়ে দিল।

মল্লিকার দু'চক্ষুর কোল বেয়ে তখন অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

জায়গা কিনে রতিকান্ত মিতার বাড়ি তৈরী করছিল।

কথা ছিল আগামী পূজার সময় বাড়ি তৈরী হয়ে গেলে ওরা সকলে সেই বাড়িতে উঠে যাবে। এবং রতিকান্তর বাড়িটা ভাড়া খাটবে।

রতিকান্ত ইদানিং মিতার সেই বাড়ি তৈরীর ব্যাপার নিয়েই দিবারাত্রি ব্যস্ত। সে তার পূর্বের কাজও ছেড়ে দিয়েছিল।

পরের দিন প্রত্যুষে চা পানের পর রতিকান্ত যখন নতুন বাড়ি তদারক করবার জন্য বেরুচ্ছে সামনে এসে দাঁড়ালো মল্লিকা।

সারাটা রাত সে ঘুমায়নি! বসে বসে কেঁদেছে। দু চোখ ফোলা। মুখটা থম থম করছে।

কোথায় চললে শুনি!

ইলেকট্রিক ওয়্যারিং প্রায় কমপ্লিট হয়ে এলো, কিছু অদল বদল করতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার মিঃ দত্তকে আজ সে সবগুলো বুঝিয়ে দিতে হবে। সকাল সকাল আসতে বলেছি তাকে।

সহসা যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো।

গম্ভীর কণ্ঠে মল্লিকা বললে, এ বাড়িতে মিতার আর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না।

কেন, হঠাৎ আবার কি হলো?

ইদানিং মিতার রাত করে বাড়ি ফেরার ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে স্ত্রীর খিটি মিটি বাধছিল, রতিকান্তর সেটা অজানা ছিল না।

ভাবলে বুঝি সে রকমই কিছু হবে বা।

ওর বাড়ির একতলা তো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, বলে দিও আজই যেন ও তার নিজের বাড়িতে উঠে যায়, মল্লিকা বলে।

কিন্তু ব্যাপারটা হলো কি?

যা বললাম তাই করো গে। নচেৎ জানো আজই আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। বলে আর দাঁড়ায় না মল্লিকা, সোজা রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হয়।

মিতা তখন সবে ঘুম ভেঙে উঠে দরজার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, মল্লিকার প্রত্যেকটি কথাই তার কানে যায়।

আচ্ছা, শোনই না কথাটা! রতিকান্ত আবার স্ত্রীকে ডাকে, বলে, আবার নতুন করে কি নিয়ে গোলমাল বাধলো?

এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, বেশ্যাবাড়ি নয়!

মল্লিকা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—তোমার সোহাগের মিনতি দেবীকে ভাল করেই কথাটা বুঝিয়ে দিও।

মল্লিকা আর দাঁড়ালো না। হন হন করে সেখান থেকে চলে গেল।

হতভম্ব রতিকান্ত কি করবে বুঝতে না পেরে ঘুরে তাকাতেই অদূরে শয়নঘরের খোলা দরজার উপর দণ্ডায়মান পাথরের মত মিনতির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল—

কি ব্যাপার মীনু! তোমার দিদির হঠাৎ সকাল বেলাতেই ঐ রণচণ্ডি মূর্তি কেন?

আমি কাল রাত্রে মদ খেয়ে এসেছিলাম রতি দা!

মদ!

হ্যাঁ, কিন্তু আর খাবো না, বলে সোজা মিতা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

১৫

কিন্তু মল্লিকাকে মিতা ঠিক চিনতে পারেনি।

আর সে বুঝতেও পারেনি মল্লিকার কতবড় ব্যথার স্থানে সে গতরাত্রে মর্মান্তিক আঘাত হেনেছিল।

মল্লিকা রান্নাঘরে বঁটি পেতে তরকারী কুটছিল।

নিঃশব্দে এসে পেছনে দাঁড়ালো মিনতি।

দিদি!

কোন সাড়া দেয় না মল্লিকা।

আমাকে ক্ষমা করো দিদি, সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে।

তবু কোন সাড়া দেয় না মল্লিকা। যেমন তরকারী কুটছিল তেমনিই কুটতে থাকে।

দিদি, কথাও বলবে না আমার সঙ্গে?

আমার যা বলবার ছিল একটু আগেই তা বলে এসেছি! কঠিন কণ্ঠে এবারে প্রত্যুত্তর দেয় মল্লিকা।

তাহ'লে সত্যিই তুমি এ-বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

যদি তাই মনে করো তো তাই।

অন্যায় একটা করে ফেলেছি সত্যি, কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই! আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনো তোমার অবাধ্য হবো না।

আমাদের প্রয়োজন তোমার ফুরিয়েছে মিনতি! আজ তুমি টাকা, সম্মান, প্রতিপত্তি সব পেয়েছো, যত দিন যাবে আরো আসবে, আজ আর আমাদের আঁকড়ে থেকে তোমার কোন তো লাভ নেই!

তাই সময় থাকতে আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পরের বিদায় নেওয়াটাই মঙ্গল ভেবে তোমাকে চলে যেতে বলেছি!

তাহ'লে এই তোমার শেষ কথা!

প্রচণ্ড অভিমানে বুকটা ফুলে ওঠে মিতার।

দুঃখ করো না মিনতি! আজ যে পথে তুমি এগিয়ে চলেছো আমাদের মত মধ্যবিত্ত সংসারের সেটা চেনা রাস্তা নয়। তুমিও তাই আমাদের মানিয়ে নিতে পারবে না, আমরাও পারবো না মানিয়ে নিতে তোমাকে!

কিন্তু—

না, সাফল্যের দিনে প্রলোভনটা চারিদিক থেকে আসা যেমন স্বাভাবিক তেমনি তাকে এড়িয়ে চলাটাও দুঃসাধ্য। আজকে তোমার সেই দিন এসেছে যখন, আমি-ই বা আমার সংস্কার আর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি নিয়ে তোমাকে পদে পদে বাধা দিই কেন। আর এখানে থাকলে সেটাকে এড়িয়ে চলাও যাবে না যখন তখন আজ তোমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

বেশ। তাই হবে—

মিতা আর দাঁড়ালো না।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এবং সোজা ঘরে এসে একটা সুটকেশ টেনে নিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে হাতের কাছে যা জামা কাপড় ছিল ভরতে থাকে।

হ্যাঁ, চলেই যাবে সে! তুচ্ছ একটা ভ্রান্তির যদি এমনি গুরুদণ্ড হয়, থাকতে আর চায় না সে এ বাড়িতে।

কোনমতে শাড়ীটা পরে নিয়ে পায়ে জুতোটা ঢুকিয়ে একহাতে সুটকেশ ও অন্য হাতে ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে দরজার দিকে যেমন অগ্রসর হয়েছে মিতা, জলখাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মল্লিকা এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

একি! এখুনি কোথায় যাচ্ছো? যেতে বলেছি বলে কি এখুনি চলে যেতে হবে নাকি!

পথ ছাড়ো মল্লিকাদি, আমি এখুনি যাবো!

বেশ, কাল সারারাত তো পেটে কিছু পড়েনি, খেয়ে নাও আগে—

না! সরো—

ছেলেমানুষি করোনা মিনতি, যেতে তোমাকে আমি বলেছি সত্যি, তাই বলে এখুনি বলিনি! নাও বোস, খেয়ে নাও—

মিনতি মল্লিকার কথার কোন জবাব না দিয়ে তাকে পাশ কাটিয়েই দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল।

মিনতি!

পিছন থেকে ডাকলো মল্লিকা।

মিনতি কোন সাড়া দিল না। বাইরে তার জুতোর শব্দটা মিলিয়ে গেল।

জলখাবারের প্লেট ও চায়ের কাপ হাতে পাথরের মতই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো মল্লিকা।

নিজের বাড়িতে নয়, মিনতি এসে উঠ্‌লো একটা হোটেলে।

মল্লিকার কথায় যতই রাগ করে সে চলে আসুক না কেন, হোটেলের নিভৃত কক্ষে, নিভৃত শয্যায় শুয়ে তার দু'চোখের কোন ছাপিয়ে অশ্রু নেমে আসে।

আজ সে সত্যিই একা!

কেউ আজ তার পাশে নেই! অনাত্মীয় হয়েও পরমাত্মীয়ের মত যার সদা সশংকিত, সতর্ক স্নেহদৃষ্টি গত চার বৎসর তাকে অনুক্ষণ মায়ের মতই ঘিরে ছিল, আজ আর সেই দৃষ্টির প্রহরা তার উপরে নেই!

চরম আনন্দের মুহূর্তেও আনন্দ জানাবার যেমন কেউ নেই তেমনি চরম

দুঃখের মুহূর্তেও সমবেদনায় পাশটিতে এসে দাঁড়াবার মত আজ আর কেউ তার রইলো না এ সংসারে।

একা। সে আজ একা!

ভুল তারই হয়েছিল। নইলে পর কখনো আপনার হয় কোনদিন! জন্মমুহূর্ত থেকেই ভাগ্য যেখানে বিরূপ, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে যাকে বারবার পর্যদুস্ত হতে হয়েছে।

সারাটা দিন মিতা উঠ্‌লোও না শয্যা থেকে, কিছু মুখে পর্যন্ত দিল না। মুখ গুঁজে শয্যার উপর শুয়েই রইলো।

মল্লিকা যেমন মিতাকে ভালবেসেছিল মিতাও তেমনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল বুঝি মল্লিকাকে।

মল্লিকার ভিতরে যেন সে তার হারানো মাকে খুঁজে পেয়েছিল।

সেই মল্লিকা যখন একদিন মাত্র সে দু পেগ মদ খেয়েছে বলে এমনি নিষ্ঠুরের মত তাকে তার গৃহ থেকে চলে যেতে বললো, অভিমানে মিতার বুকখানা যেন গুড়িয়ে গেল।

পরম বিশ্বাস ও নির্ভরতায় যেখানে সে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়েছিল সেই পায়ের তলার মাটিটাই যখন তাকে এতবড় আঘাত দিয়ে ধ্বসে গেল, মিতা যেন কোথায়ও আর কোন আশ্বাসই দেখতে পেল না।

এবং যত সে ব্যাপারটা ভাবতো লাগলো ততই যেন মল্লিকার প্রতি অভিমানটা তার দুর্জয় হয়ে উঠ্‌তে থাকে।

সব শূন্য, সব যেন বিরাট একটা ফাঁকি, মিতার কেবলই মনে হয়।

আর কেমন করে মল্লিকার ওপরে সে প্রতিশোধ নেবে, তাকে জব্দ করবে এই কথাটাই বার বার ভাবতে থাকে।

এবং শেষ পর্যন্ত সেই অভিমানে অন্ধ হয়েই একসময় বেল টিপে বেয়ারাকে ঘরের মধ্যে ডাকলো।

বেয়ারা এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়ালো।

এক বোতল হুইসকি, দু বোতল সোডা আর গ্লাস দিয়ে যাও।

বেয়ারা প্রথমটায় মিতার কথায় যেন একটু অবাক হয়েই তার দিকে তাকায়। বলে কি মেয়েটা, এক বোতল হুইসকি।

কিঁউ হামরা বাত সমঝা কি নেই।

জি মেমসাব। আভি লাতে হু!

হাঁ, জলদি।

একটু পরেই ট্রেতে করে মদের বোতল, সোডার বোতল ও গ্লাস এনে ছোট টেবিলটার ওপরে নামিয়ে রাখল বেয়ারা।

আউর কুছ জরুরত হ্যায় মেম্‌সাব্‌।

নেহি। তুম যানে সেকতা।

সেলাম জানিয়ে বেয়ারা চলে গেল ঘর থেকে।

১৬

খাবো, আরো খাবো, তোমার কি, যত খুশী আমার—আমি খাবো! মনে মনে বলতে বলতে মিতা পেগের পর পেগ হুইস্কী নিঃশেষ করতে থাকে।

মাথায় যেন মিতার খুন চেপেছে।

এক সময় বোতলটা শেষ হয়ে গেল।

আবার বেল বাজিয়ে মিতা হোটেলের বেয়ারাকে কামরায় ডেকে পাঠালো।

পুরো এক বোতল হুইসকী পান করে মিতার সর্বাঙ্গ তখন শিথিল। দুটি চক্ষু ঢুলু ঢুলু। কথা জড়িয়ে এসেছে—

আউর এক বোতল হুইসকী লাও!

বেয়ারাটা কোন সাড়া দেয় না। শুধু নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মিতার নেশায় রক্তিম থম থমে মুখখানির দিকে।

বুদ্ধুর মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কি নিয়ে আয়—

বেয়ারাটা চলে গেল।

উঠে বুঝি ঐ সময় দাঁড়াবার চেষ্টা করে মিতা কিন্তু পারে না। সমস্ত শরীর তখন টলছে।

দেহের ভারসাম্য রাখাই বুঝি কষ্টকর।

টাল সামলাতে পারে না মিতা, সোফার হাতলের উপর এলিয়ে পড়ে যায়। গতরাত থেকে পেটে বিন্দু মাত্রও আহার্য পড়েনি তার উপর এক বোতল মদ শূন্য পাকস্থলীতে।

যা হবার তাই হয়েছে।

নেশার ঘোরে সমস্ত কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

সব কেমন ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট।

গায়ের বস্ত্র শিথিল এলোমেলো, খোঁপা খুলে নিবিড় কেশরাশি এলিয়ে পড়েছে।

নেশার ঘোরেই গুণ গুণ করে গান গাইতে থাকে মিতা জড়িয়ে জড়িয়ে ঃ

আমার এপথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে।।

আমার ফুলে আর কি কবে তোমার মালা গাঁথা হবে,

তোমার বাঁশী দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডাকে।।

আর এক বোতল হুইসকি নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করে বেয়ারাটা থমকে দাঁড়ায়।

গুণ গুণিয়ে চলেছে তখনো মিতা জড়িত কণ্ঠে।

মেম্‌সাব্!

কে?

হুইসকী লায়া!

গ্লাস মে ডাল দো!

আর মাত পিও মেম্‌সাব্!

কেয়া!

আর মাত পিও—

Get out! Get out—চিৎকার করে ওঠে মিতা জড়িত কণ্ঠে নেশার ঝোঁকে।

চার চারটে দিন ক্রমান্বয়ে মিতা কেবল দিবারাত্র মদ্যপানই করে গেল। কিন্তু শরীরে অত অত্যাচার সহ্য হবে কেন!

মিতা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মল্লিকাকে কিছু না বলে একটা মাত্র সুটকেশ ও ভ্যানিটি ব্যাগটা নিয়ে মিতা রতিকান্তর বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল তারপর কেউ আর তার কোন সন্ধান পায় না।

রতিকান্ত ঐ দিন দ্বিপ্রহরে বাড়িতে ফিরে মল্লিকার কাছে সব শুনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

রাগ হোক বা অভিমান হোক ঝোঁকের মাথায় মেয়েটা কোথায় গেল।

নিজের বাড়িতে সে যায়নি।

এ দুনিয়ায় মেয়েটার এমন কোন আত্মীয় স্বজনও নেই যেখানে গিয়ে একবেলা থাকতে পারে।

পরে একদিন রতিকান্তর মুখেই শুনেছিল মিতা, চার চারটে দিন নাকি সে পাগলের মতই শহরের সর্বত্র মিতাকে খুঁজে বেড়িয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত থানায় সে সংবাদ দেয়।

থানার ইন্‌সপেক্টার খোঁজ করতে করতে হোটেলে এসে মিতার সন্ধান পায় বটে তবে তখন মিতাকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইন্‌সপেক্টারের কাছে সংবাদ পেয়ে রতিকান্ত আর মল্লিকা ছুটে গেল হাসপাতালে।

কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে মিতার অসুস্থতার কারণ শুনে মিতার কেবিনের দিকে অগ্রসর হতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল মল্লিকা।

স্ত্রীকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে রতিকান্ত বলেছিল, কি হলো থামলে কেন, চল!

না। তুমিই যাও!

কেন, তুমি যাবে না?

না—তুমি যাও দেখে এসো, আমি এখানেই বসছি।

মল্লিকা কিছুতেই যায়নি।

রতিকান্তর কোন অনুরোধই সে শোনে নি।

অগত্যা রতিকান্তই একা গিয়ে কেবিনে ঢুকেছিল। চোখ বুজে মিতা শুয়েছিল শয্যার উপর।

সমস্ত মুখখানি জুড়ে মিতার যেন বিষণ্ণ ক্লান্তির একটি ছায়া।

মাথার রুক্ষ্ম কেশ বালিশের দু'পাশে বিনুণি করা।

দুটি চক্ষু বোজা।

মীনু!

কে! ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালো মিতা।

ছিঃ ছিঃ, এ তুমি করেছো কি! এমনি করে নিজের সর্বনাশ কেউ করে!

মিতা তখন কিন্তু ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিটা তার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে।

রতিদা?

কি রে?

দিদি আসেনি?

হ্যাঁ, এসেছে তো!

এসেছে, সত্যি বলছো?

হ্যাঁ রে—

ডাকো না একবার তাকে এ-ঘরে।

নিশ্চয়ই। এখুনি তাকে আমি ডেকে নিয়ে আসছি। রতিকান্ত কেবিন থেকে তখুনি বের হয়ে গেল।

কিন্তু ওয়েটিং রুমে গিয়ে দেখেছিল রতিকান্ত, মল্লিকা সেখানে নেই।

মল্লিকা বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।

অল্পক্ষণ বাদেই একাকী রতিকান্তকে ফিরতে দেখে ব্যগ্র কণ্ঠে শুধায় মিতা—কই, দিদি এলো না!

হ্যাঁ, মানে আসবে বৈকি, নিশ্চয়ই আসবে, আমি নিজে তাকে নিয়ে আসবো।

না রতিদা, তাকে আর আসতে হবে না।

মুখটা ফিরিয়ে নেয় মিতা।

একটু বোধ হয় অভিমান হয়েছে। কাল এসে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। বাড়িতে গেলেই তোমার দিদির অভিমান মিটে যাবে।

বাড়ি কতদূর হলো রতিদা?

ও এক রকম কমপ্লিট বললেই চলে।

থাকা যাবে?

থাকা যাবে না মানে, থাকলেই হয়।

তা'হলে, কাল তুমি এসো—আমি নতুন বাড়িতেই গিয়ে উঠবো।

কাল কি করে হবে! সব গোছ গাছ না করে। তা ছাড়া নতুন বাড়ি সব ধোয়া মোছাও করতে হবে।

দশ বারজন লোক লাগিয়ে কাল সারা দিনের মধ্যে সেই ব্যবস্থা করে ফেলবে রতিদা, কাল সন্ধ্যায়ই আমি বাড়িতে যাবো। টাকা যা লাগে, আমার বাক্সে চেক বই আছে নিয়ে এসো সই করে দেবো। ব্যাঙ্ক থেকে তুমি টাকা তুলে নিও।

বেশ তো কিন্তু—

তোমাকে যা বললাম তাই করো, তারপর একটু থেমে বললে—রতিদা, একটা কথা—

বল।

মল্লিকাদি আমার বাড়িতে যাবে না জানি তবে তাকে বলো সেদিন সে আমাকে ক্ষমা করলে হয়তো সত্যিই আর জীবনে কখনো মদ স্পর্শ করতাম না।

কথাটা বলতে বলতে মিতা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

দিন দুই পরেই মিতা তার বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের নতুন বাড়িতে উঠে এসেছিল।

গাড়ি থেকে নেমে মিতা আশা করেছিল অন্তত আর কাউকে না হোক রতিকান্তকে সে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।

কিন্তু পায়নি।

দারোয়ান একগোছা চাবি ও একটা পুরু বড় খাম তার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, বাবু সেগুলো দিয়ে গিয়েছে তাকে দেবার জন্য।

বাবু কোথায় দারোয়ান?

বাবু তো সেই সকালেই আমার হাতে এগুলো দিয়ে চলে গেছেন মাইজী!

কিছু আর বলে যাননি!

নাতো!

কখন আবার আসবেন বলে গিয়েছেন কিছু?

না।

সব গোছগাছ করে দিয়ে গিয়েছিল রতিকান্ত।

এমনকি একটি পাচক, একটি নেপালী আয়া, ফুটফরমাস খাটবার জন্য একজন ছোকরা চাকরও নিযুক্ত করে গিয়েছিল রতিকান্ত।

ভিতরে ঢুকতে যেন পা সরছিল না মিতার।

সুসজ্জিত পারলারে একটা সোফার ওপরে বসে পড়ে মিতা।

চিরদিন সকলে একসঙ্গে থাকবে।

কত আনন্দ ও সুখের কল্পনায় ওরা দুজনে গত আট মাস ধরে রাত্রি দিন মশগুল হয়ে থেকেছে।

মল্লিকা নিজে পছন্দ করে জায়গা কিনেছিল।

বাড়ির প্ল্যানও তার পছন্দ মত করিয়েছে।

বাড়ির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সে পছন্দ করে দিয়েছে। এজন্য কত তার খুঁতখুঁতুনি ছিল।

রতিকান্ত ঐ নিয়ে স্ত্রীকে কত সময় কত ব্যঙ্গ করেছে।

বলেছে, তবু যদি নিজের বাড়ি হতো তোমার।

কেন, মীনুর বাড়ি বুঝি আমার বাড়ি নয়! মল্লিকা জবাব দিয়েছে।

কিন্তু যে রেটে মীনু বড়লোক হয়ে চলেছে যদি একদিন গরীব বলে তোমাকেও চিনতে না পারে!

চিনতে না পারলেই হোল অমনি! ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় করে দেবো না।

রতিকান্ত বলেছে, শুনছো মীনু, তোমার দিদি কি বলেছে!

ঠিকই তো বলেছে দিদি, এতো দিদিরই বাড়ি।

শেষ পর্যন্ত কোথা থেকে কি হয়ে গেল!

বুকখানা কাঁপিয়ে মিতার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

নেপালী আয়া কাঞ্চী এসে সামনে দাঁড়ালো, চা দেবো মেমসাহেব!

চা! নিয়ে আয়।

চা পান করতে করতেই মিতা খামটা ছিঁড়ে ফেললো একসময়।

বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে যাবতীয় বিল, মেমো, রসিদ, প্রত্যেকটি পাই পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে রতিকান্ত।

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিতা কাগজগুলোর দিকে।

তারপর একসময় উঠে পায়ে পায়ে ভিতরে প্রবেশ করে। এঘর থেকে ওঘর, এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা অন্যমনস্কভাবে মিতা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

এর যাবতীয় কৃতিত্ব রতিকান্তর, মল্লিকার।

গত তিন বৎসরে যা সে উপায় করেছে সব সঞ্চিত করে রেখেছিল ওরা স্বামী স্ত্রী!

একটি পয়সা অযথা ব্যয় করতে দেয়নি।

এমনকি যে পাঁচ ছয়টা বইতে সে কাজ করেছে গত একবৎসরে সব বইতে কনট্রাক্ট পর্যন্ত রতিকান্তর পরামর্শ মতো হয়েছে।

রতিকান্তই টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সেরাত্রে একটিবারের জন্যও মিতা দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না।

নিরুপায় একটা অভিমানে সে গুমরাতে লাগলো।

মিতা ভেবেছিল সত্যিই চিরদিন মল্লিকা তার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না।

তাছাড়া রতিকান্ত আছে সে নিশ্চয়ই মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে তার ওখানে আসবে।

কিন্তু বৃথাই আশা।

দিন সপ্তাহ মাস প্রায় বছর ঘুরতে চললো, না এলো মল্লিকা, না এলো রতিকান্ত একটি দিনের জন্য ওর ওখানে।

ওদিকে মিতার তখন ছবির পর ছবি হিট্, সুপার হিট্ করে চলেছে।

দু'হাতে সে অর্থ উপায় করেছে।

নানা বয়েসী নতুন নতুন বন্ধুবান্ধবের দল তার চার পাশে এসে ভিড় করতে শুরু করেছে।

নতুন গাড়ি কিনেছে।

ব্যাঙ্কে আরো অনেক টাকা জমেছে।

ছবি, ছবি আর ছবি।

চিত্রজগতে তখন মাত্র দু'টি নাম, মিতা রায় আর কৃষ্ণ কুমার।

এমন সময় একদিন ফ্লোরে সুটিং শেষে বিশ্রাম নিচ্ছে মিতা, একজনের কাছে শুনলো, মাস দুই আগে হঠাৎ স্ট্রোকে প্যারালিসিস হয়ে নাকি রতিকান্ত পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

চিকিৎসার ব্যাপারে প্রচুর অর্থব্যয় করে আজ তাদের অবস্থাও নাকি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা শুনেই মিতার প্রাণটা যেন কেমন করে ওঠে।

ফিরতি পথে সুটিং সেরে গাড়ি নিয়ে সোজা মিতা সেই পরিচিত বাড়িটার সামনে গিয়ে নামলো। কিন্তু সদর দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

অপরিচিত মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে ছিলেন বসে, শুধালেন তিনি, কে আপনি, কাকে চান?

এ বাড়িতে রতিকান্তবাবু থাকতেন না?

হ্যাঁ, থাকতেন। কিন্তু তারা তো আজ দিন দশেক হলো এ বাড়ি আমাকে বিক্রি করে চলে গেছেন।

চলে গেছেন!

হ্যাঁ।

ও, তা তারা কোথায় এখন আছেন বলতে পারেন?

না।

আচ্ছা আসি, নমস্কার।

মন্থর পদে এসে মিতা আবার তার গাড়িতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার শুধায়, কোথায় যাবো?

কিন্তু যে রেটে মীনু বড়লোক হয়ে চলেছে যদি একদিন গরীব বলে তোমাকেও চিনতে না পারে!

চিনতে না পারলেই হোল অমনি! ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় করে দেবো না।

রতিকান্ত বলেছে, শুনছো মীনু, তোমার দিদি কি বলেছে!

ঠিকই তো বলেছে দিদি, এতো দিদিরই বাড়ি।

শেষ পর্যন্ত কোথা থেকে কি হয়ে গেল!

বুকখানা কাঁপিয়ে মিতার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

নেপালী আয়া কাঞ্চী এসে সামনে দাঁড়ালো, চা দেবো মেমসাহেব!

চা! নিয়ে আয়।

চা পান করতে করতেই মিতা খামটা ছিঁড়ে ফেললো একসময়।

বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে যাবতীয় বিল, মেমো, রসিদ, প্রত্যেকটি পাই পয়সার হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে রতিকান্ত।

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিতা কাগজগুলোর দিকে।

তারপর একসময় উঠে পায়ে পায়ে ভিতরে প্রবেশ করে। এঘর থেকে ওঘর, এ বারান্দা থেকে ও বারান্দা অন্যমনস্কভাবে মিতা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

এর যাবতীয় কৃতিত্ব রতিকান্তর, মল্লিকার।

গত তিন বৎসরে যা সে উপায় করেছে সব সঞ্চিত করে রেখেছিল ওরা স্বামী স্ত্রী!

একটি পয়সা অযথা ব্যয় করতে দেয়নি।

এমনকি যে পাঁচ ছয়টা বইতে সে কাজ করেছে গত একবৎসরে সব বইতে কন্ট্রাক্ট পর্যন্ত রতিকান্তর পরামর্শ মতো হয়েছে।

রতিকান্তই টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করে দিয়েছে।

সেরাত্রে একটিবারের জন্যও মিতা দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না।

নিরুপায় একটা অভিমানে সে গুমরাতে লাগলো।

মিতা ভেবেছিল সত্যিই চিরদিন মল্লিকা তার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না।

তাছাড়া রতিকান্ত আছে সে নিশ্চয়ই মল্লিকাকে সঙ্গে নিয়ে তার ওখানে আসবে।

কিন্তু বৃথাই আশা।

দিন সপ্তাহ মাস প্রায় বছর ঘুরতে চললো, না এলো মল্লিকা, না এলো রতিকান্ত একটি দিনের জন্য ওর ওখানে।

ওদিকে মিতার তখন ছবির পর ছবি হিট্, সুপার হিট্ করে চলেছে।

দু'হাতে সে অর্থ উপায় করেছে।

নানা বয়েসী নতুন নতুন বন্ধুবান্ধবের দল তার চার পাশে এসে ভিড় করতে শুরু করেছে।

নতুন গাড়ি কিনেছে।

ব্যাঙ্কে আরো অনেক টাকা জমেছে।

ছবি, ছবি আর ছবি।

চিত্রজগতে তখন মাত্র দু'টি নাম, মিতা রায় আর কৃষ্ণ কুমার।

এমন সময় একদিন ফ্লোরে সুটিং শেষে বিশ্রাম নিচ্ছে মিতা, একজনের কাছে শুনলো, মাস দুই আগে হঠাৎ স্ট্রোকে প্যারালিসিস হয়ে নাকি রতিকান্ত পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

চিকিৎসার ব্যাপারে প্রচুর অর্থব্যয় করে আজ তাদের অবস্থাও নাকি শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাটা শুনেই মিতার প্রাণটা যেন কেমন করে ওঠে।

ফিরতি পথে সুটিং সেরে গাড়ি নিয়ে সোজা মিতা সেই পরিচিত বাড়িটার সামনে গিয়ে নামলো। কিন্তু সদর দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

অপরিচিত মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে ছিলেন বসে, শুধালেন তিনি, কে আপনি, কাকে চান?

এ বাড়িতে রতিকান্তবাবু থাকতেন না?

হ্যাঁ, থাকতেন। কিন্তু তারা তো আজ দিন দশেক হলো এ বাড়ি আমাকে বিক্রি করে চলে গেছেন।

চলে গেছেন!

হ্যাঁ।

ও, তা তারা কোথায় এখন আছেন বলতে পারেন?

না।

আচ্ছা আসি, নমস্কার।

মন্থর পদে এসে মিতা আবার তার গাড়িতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার শুধায়, কোথায় যাবো?

বাড়ি।

তারপর আরো একটা বৎসর চলে গিয়েছে। মিতার জীবনের আরো অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

রতিকান্ত বা মল্লিকার আর কোন সন্ধানই পায়নি মিতা।

বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ তারকা, চিত্রাভিনেত্রী মিতা রায়কে নিয়ে আলোচনার আর অন্ত নেই। কৌতূহলেরও অন্ত নেই। তার জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি জনসাধারণের যেন আজ নখদর্পণে। মুগ্ধ স্তাবকের দ্বারা সর্বক্ষণ সে আজ পরিবৃত।

কিন্তু—

সহসা চিন্তাজাল যেন ছিন্ন হয়ে গেল মিতার। সুনীল, রতীশ, কৃষ্ণকুমার, স্যাণ্টি—তার চারপাশে, কিন্তু তাদের মধ্যে যেন বিশেষ একটা বিশেষত্ব নিয়ে আজকের রাতের সেই ক্ষণ পরিচিত 'কাফে দ্য মণিকো'র নগণ্য একজন' বেহালাবাজিয়ে বার বার তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

অভিজাত সমাজের লক্ষপতি ধনীর পুত্রেরা আজ তার এতটুকু কৃপার জন্য লালায়িত, সর্বক্ষণ মধুলোভী মৌমাছির মত গুণ গুণ করে ফিরছে তার চারপাশে, তাদের মধ্যে ঐ নগণ্য হোটেলের সামান্য একজন বেহালা বাজিয়ে—

সত্যিই হাসি পায় মিতার। এখনো সে তারই কথা ভাবছে ভেবে সত্যিই তার হাসি পায়।

রাতের অন্ধকার ইতিমধ্যে যে কখন ফিকে হয়ে এসেছে টেরও পায়নি মিতা। সহসা কাঞ্চির কণ্ঠস্বরে মিতা যেন চমকে ওঠে।

চা!

কাঞ্চী প্রভাতী চা নিয়ে এসেছে নিত্যকার মতো। চায়ের ট্রে-টা সামনে নামিয়ে রেখে কাঞ্চি যেমন এসেছিল তেমনি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

১

ওয়েটারের মুখে কথাটা শুনে পার্থ একটু যেন অবাকই হয়ে গিয়েছিল।

বিরাট একটা গাড়ি নিয়ে একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা নাকি তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছেন।

রাত তখন এগারোটা বেজে গিয়েছে। হোটেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফিরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল পার্থপ্রতিম। এমন সময় হোটেলের একজন ওয়েটার এসে সংবাদটা দিল।

তুমি বোধহয় ভুল করছো মণিরাম, আমার কাছে স্ত্রীলোক আবার কে আসবে। ভাল করে জেনে দেখগে অন্য কাউকে হয়তো খুঁজছেন তিনি।

না চৌধুরীবাবু, আপনার নামই তিনি বলেছেন।

দূর, তুমি আবার যাও, ভাল করে আর একবার জিজ্ঞাসা করগে—পার্থপ্রতিম বলে।

ওয়েটার মণিরাম চলে গেল এবং মিনিট কয়েক বাদেই ফিরে এসে বললে, আপনাকেই ডাকছেন তিনি।

আমাকেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ—

নাম কিছু বললেন?

আজ্ঞে না। বললেন তিনি আপনাকে চেনেন—আপনি তাকে চেনেন না।

ডি'সুজা পাশেই দাঁড়িয়েছিল, কৌতুকতরল কণ্ঠে এবার বললে, যাওনা, দেখেই এসো না, হয়ত মনের মানুষও হতে পারেন।

আঃ কি হচ্ছে ডি'সুজা—

এত রাত্রে এসেছেন যখন তখন কি আর সাধারণ কেউ হবেন। যাও, যাও—

বিশেষ একটু কৌতূহল নিয়েই যেন বের হয়ে এলো পার্থপ্রতিম। বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি একটা পেভমেণ্টের সামনে পার্ক করা আছে।

গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই অন্ধকার গাড়ির ভিতর থেকে নারী কণ্ঠে আহ্বান শোনা গেল, নমস্কার—

চমকে ওঠে পার্থ কণ্ঠস্বর শুনেই!

এ কণ্ঠস্বর তো ভোলবার নয়। এ যে তার অন্তরে অন্তরে গাঁথা হয়ে গিয়েছে সেই রাত্রেই!

নমস্কার! আ—আপনি—

কেমন যেন থতমত খেয়ে যায় পার্থপ্রতিম।

গাড়ির চৌকো জানালা পথের ফ্রেমে একখানি মুখ।

অদূরবর্তী লাইট পোস্টের সামান্য আলো এসে মুখখানির একাংশে এসে পড়েছে, আলো আঁধারে মেশামেশি তারই মধ্যে স্বপ্নের মত কিছুটা স্পষ্ট কিছুটা অস্পষ্ট একখানি মুখ।

সুচারু কপালের ওপরে এসে লতিয়ে নেমেছে যেন চুলের একটি নট্।

আবার প্রশ্ন হলো, চিনতে পারছেন না বুঝি?

হ্যাঁ, মানে—

এখন তো বাড়ি ফিরবেন!

হ্যাঁ, কিন্তু—

আসুন আমিও এই পথেই ফিরছিলাম এই রাস্তা দিয়ে, হঠাৎ মনে পড়লো এতটা পথ একা একা যাবো, ভারি বোরিং, যদি আপনাকে কম্পানী পাওয়া যায়। ভাগ্য ভাল দেখছি যে দেখাটা পেয়ে গেলাম।

পার্থপ্রতিম যেন একেবারে বোবা।

বাঃ রে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন।

তবু নিশ্চুপ যেমন দাঁড়িয়ে ছিল পার্থপ্রতিম তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যি ও যেন একেবারে বোবা বনে গিয়েছে।

কি হলো, আসুন! ভয় নেই বিশ্বাস করুন একটি ফোঁটাও ড্রিঙ্ক করিনি আজ, অ্যাবসুলটলি নরম্যাল এণ্ড সোবার—

বলতে বলতে গাড়ির দরজাটা খুলে দেয় মিতা।

কতকটা যন্ত্র চালিতের মতই যেন পার্থ এসে গাড়িতে ফ্রন্ট সীটে মিতার পাশে উঠে বসলো। সুইচ্ দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল মিতা।

আজ সেই বাচ্চা সফারটা গাড়িতে ছিল না, একাই ছিল মিতা।

মাত্র দিন পাঁচেক আগে এমনি একটি রাত্রে এই গাড়িতেই এই সীটে এরই পাশে বসে ছিল পার্থ।

আজও সেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে এসে লাগে পার্থর।

হঠাৎ একসময় মিতা প্রশ্ন করে গাড়ি চালাতে চালাতে, কিন্তু সত্যিই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার আপনার কোন প্রয়োজন আছে নাকি পার্থবাবু?

হ্যাঁ, বাড়িতে তো ফিরতেই হবে।

না, না—ফিরবেন বৈকি! কিন্তু একটু যদি ঘুরে যাই রেড রোড, স্ট্র্যাণ্ড রোডটা দিয়ে আপত্তি আছে?

না, আপত্তি আর কি তার!

তবে আবার কি! বলতে বলতে ততক্ষণে ষ্টিয়ারিং হুইলটা ডাইনে ঘুরিয়ে গাড়ি মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে মিতা।

নির্জন মেটাল বাঁধানো রাস্তা দিয়ে দামী বড় গাড়ি নিঃশব্দে চল্লিশ মাইল স্পীডে ছুটে চলে।

কি ভাবছেন!

না, কই কিছু না তো।

কিছুই ভাবছেন না!

না তো।

উহুঁ! নিশ্চয়ই ভাবছেন। মৃদু হেসে মিতা বলে।

ভাবছি!

হুঁ। তারপরই একটু হেসে বলে, কিন্তু সত্যি সত্যিই আচমকা এতরাত্রে আপনাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলাম কেন, জানেন?

নাতো।

জানেন না।

না।

আপনার বেহালা বাজানো শুনব বলে!

বেহালা বাজানো শুনবেন!

হুঁ! গঙ্গার ধারে বসে আপনার বেহালা বাজানো শুনবো।

ও, কিন্তু আমিতো—

বেহালাটা আনেননি, এই তো!

হ্যাঁ, মানে—

তাতে আর কি হয়েছে, আমার কাছে একটা আলাদীনের প্রদীপ আছে, তাকে হুকুম করলেই বেহালা এসে যাবে। বলতে বলতে মিতা মিষ্টি হাসি হেসে ওঠে।

নির্জন গঙ্গার ধারে এসে বিরাট একটা পত্রবহুল বটগাছের সামনে গাড়িটা থামালো মিতা। গাড়ির দরজা খুলে নেমে বললে আসুন—

মিতার ঈদৃশ ব্যবহারে সত্যি বলতে কি পার্থ যেন কেমন একটু বিহ্বলই হয়ে

পড়েছিল। এতবড় একজন নামকরা অভিনেত্রী, এত গ্ল্যামার এত প্রতিপত্তি। আর কিইবা তার পরিচয়। অখ্যাত অতি সাধারণ রেস্তরাঁর এক অর্কেস্ট্রার বেহালা বাজিয়ে।

অজ্ঞাত, অপিরিচিত অতি নগন্য।

এবং একটি রাত্রের কিছুক্ষণের যৎসামান্য আলাপ। সেই সামান্য আলাপটুকুর সূত্র ধরে তাকে এই মধ্যরাত্রে একাকিনী এই গঙ্গার নির্জন উপকূলে নিয়ে এসেছেন, কিনা তার বেহালা শুনবে সে।

ব্যবহারে আলাপে এমন একটা গভীর হৃদ্যতার স্পর্শ যেন কত-কতকালের আলাপ ওদের দুজনার পরস্পরে।

একি ঐ অণন্য ধনী সুন্দরী অভিনেত্রীর তাকে নিয়ে খেয়াল, না নিছক একটা কৌতুক। খেয়ালই যদি হয় তো বিচিত্র খেয়ালই বলতে হবে। আর যদি হয় কৌতূক তো নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক!

বটগাছের তলায় একটা পাথর পড়েছিল। কেমন করে পাথরটা ওখানে এলো কেউ হয়ত জানে না। জানবার প্রয়োজনও হয়ত আজ পর্যন্ত কেউ কখনো বোধ করেনি। আর জানবার প্রয়োজনটাই বা কি!

এমনি কত পাথরই তো কত জায়গায় পড়ে থাকে।

মৃদু মৃদু বায়ু প্রবাহে পাতাগুলো অদ্ভুত কেমন একটা সিপ্ সিপ্ শব্দ করছে। আজ কোন তিথি কে জানে।

কাস্তের মত বাঁকা একফালি চাঁদ। তারই মৃদু আলোয় আকাশ, গঙ্গাবক্ষ চারিদিক যেন অদ্ভুত স্বপ্নের মতো মনে হয়। গঙ্গার অপর তীরভূমি, গাছপালা বাড়িগুলো অস্পষ্ট, একটা ধূসরপটে আঁকা যেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল পার্থপ্রতিম।

স্নিগ্ধকণ্ঠে অনুরোধ এলো, বসুন।

চমকে চেয়ে দেখলো পার্থ, পাথরটার সামনেই একটা কালো বেহালার বাক্স দাঁড় করানো রয়েছে এবং পরিধানে দামী জর্জেটের শাড়ী নিয়েই নোংরা পাথরটা উপর ইতিমধ্যে কখন একসময় বসেছে মিতা।

বসুন।

একটু ইতস্তত করে পার্থ তারপরেই মিতার পাশে বসে পড়লো।

ভারি সুন্দর, না!

হ্যাঁ—

এমনি রাতে এমনি জায়গায় কখনো এর আগে এসেছেন!

না।

কখনো আসেন নি!

না!

আশ্চর্য! কখনো এমনি রাতে এমন একটি নির্জন জায়গা কি মনে পড়ে না আপনার। কিন্তু জানেন, আমার পড়ে। এজায়গাটা আমার অত্যন্ত পরিচিত। প্রায়ই এমনি রাতে এখানে আমি এসে এই পাথরটার উপর একা একা বসে থাকি।

আশ্চর্য তো!

কেন, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

ভয় করে না?

না। ভয় করবে কেন! তারপর একটু থেমে আবার মিতা বলে, জীবনে অনেক ভয়, অনেক আশংকা সামনে আমার এসেছে তাই, ভয় আর শংকা ও দুটো বস্তুকেই আমি আর আমল দিই না। কিন্তু যাক সে কথা। আমার কথা বলবার জন্য এমনি করে এই রাত্রে আপনাকে আমি ধরে আনিনি, এসেছি আপনার বেহালা শুনবো বলে! নিন, বাক্স থেকে বেহালাটা বের করে শুরু করুন!

অগত্যা পার্থকে বাক্স থেকে বেহালাটা বের করে তুলে নিতেই হলো।

একেবারে নতুন আনকোরা বেহালা।

কিন্তু বেহালাটা যে বিশেষ ভাবে তৈরী ও অনেক দামী সেটা হাতে নিয়েই দক্ষ বাজিয়ে পার্থর মুহূর্তে বুঝতে কষ্ট হয় না।

কাঁধের উপর রেখে থুঁতনী দিয়ে চেপে ধরে বেহালার তারের গায়ে ছড়ির টান দিতেই, নিশীথের সেই গঙ্গাতীরের শান্ত নির্জনতা যেন শিহরিত হয়ে উঠলো।

বার দুই ছড়িটা তারের বুকে এদিক ওদিক টেনে শুরু করলো পার্থ বাগেশ্রী আলাপ।

মধ্যরাত্রির সেই স্তব্ধ নিঃসঙ্গ প্রকৃতি, সুরের স্পর্শে যেন শিহরিত হয়ে ওঠে।

কত দিনকার ঐ পাথরটি।

কত দিন ধরেই হয়তো ওখানে অমনি পড়ে আছে।

কত কে হয়ত কত সময় ওর উপরে এসে বসেছে কিন্তু এমনি করে কি কোন নিশীথরাতে ওর উপরে বসে এমনি সুরের মধ্যে মগ্ন হয়েছে কেউ।

লীন হয়ে গিয়েছে কেউ।

সব, সব—যেন ভুলে যায় পার্থ!

সুরের মধ্যে সে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

ভুলে যায় সে কোথায়, ভুলে যায় তার পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রোতাটির উপস্থিতির কথাটুকুও বুঝি।

বাজিয়ে চলে সে আপন মনেই একটার পর একটা সুর।

তারপর এক সময় বাজনা থামিয়ে পাশা পাশি দুজনে চুপ চাপ বসে থাকে আরো কিছুক্ষণ!

চলুন, ওঠা যাক—এক সময় মৃদুকণ্ঠে বলে মিতা।

চমকে ওঠে পার্থ যেন মিতার ডাকে।

বোবা দৃষ্টিতে তাকায় পার্থ মিতার দিকে।

উঠুন—তিনি. হয়তো এখনো আপনি ফিরছেন না দেখে এতক্ষণে চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন!

কে?

কেন, যিনি আপনাকে প্রতি রাত্রে দরজা খুলে দেন বাড়ি ফিরলে!

কে দরজা খুলে দেয়।

তা আমি কি করে জানবো!

গাড়িতে উঠে বসে গাড়ি চালাতে চালাতে আবার এক সময় প্রশ্ন করে মিতা, কিন্তু সত্যিই বলুন তো সে কে?

কার কথা বলছেন!

ঐ যে সেদিন রাত্রে যিনি এসে দরজা খুলে দিলেন।

ও।

কে সে!

আপনি তো চিনবেন না তাকে।

তা জানি। তাইতো জিজ্ঞাসা করছি তার পরিচয়।

আমরা যে বাড়িতে আছি সেই বাড়িরই নিচের তলায় থাকে তারা, ওর তিনটি বোন আর ওদের বৃদ্ধ দাদু।

কি নাম?

অনীতা।

তার পরই মিতা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

স্তব্ধ নিঃসঙ্গ রাত্রির মধ্য প্রহর।

কাস্তের মত সরু সেই একফালি চাঁদটা ইতিমধ্যে কখন যেন মহাশূন্যে দুলতে দুলতে পশ্চিম প্রান্তে হেলে পড়েছে।

মধ্য রাত্রির আলোছায়া ঘেরা বোবা রাত্রি।

২

রাত প্রায় পৌনে একটা বেজে গিয়েছিল সেদিন।

এত রাত করে কখনো পার্থ বাড়ি ফেরে না। আজ পর্যন্ত কখনো ফেরেনি।

মিতার অনুমান মিথ্যা নয়।

সত্যিই অনীতা পার্থের ফেরার পথ চেয়ে জেগে ছট্ ফট্ করছিল।

আজও মিতা গলি পর্যন্ত তার পিছু পিছু এসে, অনীতা দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কখন যে চকিতে গলির মুখে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে পার্থ আদৌ টের পায়নি।

.এবং সে রাত্রের মত আজও রাত্রে দরজা খুলতেই অনীতা পার্থর পিছনে অদূরে দণ্ডায়মান মিতাকে দেখতে পেয়েছিল।

কিন্তু আজ আর সে রাত্রের মত চুপ করে থাকলো না মিতা সম্পর্কে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠছে পার্থ, পিছনে দিক থেকে অনীতা ডাকলো মৃদু কণ্ঠে, পার্থবাবু!

ঘুরে দাঁড়ায় পার্থ, আমাকে কিছু বলছিলে অনু?

ঐ ভদ্রমহিলা কে?

ভদ্রমহিলা!

হ্যাঁ, যিনি আপনার পিছনে ছিলেন!

ওকে চেনো না?

না তো!

মিতা রায়।

ও! মিতা রায় কে?

অনীতার কৌতূহল হওয়ার স্বাভাবিক কারণ সে কখনো বড় একটা সিনেমায় যায় না।

আর সিনেমা জগতের কোন সংবাদও রাখে না।

কাল বলবো অনু। আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

পার্থ আর দাঁড়ালো না।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

সত্যিই ঘুমে চোখ দুটো যেন বুজে আসছিল তখন পার্থর। কিন্তু শয্যায় শোওয়ার পর চোখের ঘুম যে কোথায় চলে গেল পার্থ বুঝতে পারে না। অন্ধকারে খোলা জানলা পথে বাইরের রাতের কালো আকাশটার দিকে সে চেয়ে রইলো কেবল।

পরের দিন মিতা সন্ধ্যার পরে ষ্টুডিও থেকে সুটিং করে ফিরে, শয়ন ঘরে ক্লান্ত দেহটা একটা আরাম কেদারার ওপরে এলিয়ে দিয়ে, চোখ বুজে পড়ে আছে, ভৃত্য এসে জানালো, স্যাণ্টি বোস এসেছে।

ভ্রুকুঞ্চিত করে ভৃত্যের মুখের দিকে তাকালো মিতা।

বাইরের ঘরে বসে আছেন বাবু।

এখন দেখা হবে না বলে দিগে যা।

কি ব্যাপার?

সহসা ঐ মুহূর্তে স্যাণ্টির কণ্ঠস্বরে চম্‌কে চোখ তুলে তাকালো মিতা সামনের খোলা দরজার দিকে।

তার অনুমতির অপেক্ষা রাখেনি স্যাণ্টি, সোজা একেবারে তার নিজস্ব শয়নঘরে চলে এসেছে ভৃত্যকে দিয়ে সংবাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই।

শিথিল দেহবাস সামলানোরও যেন সময় পায় না মিতা। তাড়াতাড়ি সামলাতে সামলাতে বলে ওঠে, পাশের ঘরে একটু বোস স্যাণ্টি, আসছি—

ও কে—বলে স্যাণ্টি পাশের ঘরে চলে গেল।

সহসা স্যাণ্টির ঈদৃশ ব্যবহারে মিতার মনটা যেন অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠে, বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায়। কিন্তু মিতা ভুলে যায় যে স্যাণ্টির আজকের ঐ ব্যবহারের পিছনে রয়েছে তারই দেওয়া দিনের পর দিন প্রশ্রয়।

শুধু স্যাণ্টিই নয় ওদের অনেককেই এত বেশী প্রশ্রয় ও দিয়ে এসেছে যে ওরা আজ পরস্পরের প্রতি বিশেষ করে মিতাকে ঐটুকু সম্মান দেখানো প্রয়োজন মনে করে না।

মিতার নিজেরই আচারে ব্যবহারে ওরা আজ যেন মিতাকে গৃহস্থ ঘরের কোন মেয়ে বা বধূর মত ভাবা প্রয়োজনই বোধ করে না।

এবং সে জন্য দোষ ওদের তো নয়, মিতারই।

একটু পরেই মিতা এসে পাশের ঘরে প্রবেশ করলো।

এই যে মিতা, কি ব্যাপার বলতো?

একটা সোফার উপরে বসতে বসতে মিতা বলে, কেন কি ব্যাপার!

কয়দিন থেকে সন্ধ্যার পর তোমার খোঁজে এসে তোমার কোন পাত্তাই পাচ্ছি না। চাকরটাও বলছিল কয়দিন থেকে রাত করে বাড়ি ফেরো। কোন নাইট সুটিংয়ের প্রোগ্রাম চলছে নাকি?

না। সে রকম কিছু নয়।

তবে!

সব কথাই সকলকে বলতে হবে নাকি।

তাই বুঝি! বলতে বলতে স্যান্টি নিজের সোফা থেকে উঠে মিতার সোফায় তার একেবারে পাশ ঘেষে এসে বসে পড়লো।

আড় চোখে মিতা একবার তাকালো স্যান্টির দিকে।

মিতা!

কি?

স্যান্টি পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে মিতার একখানি হাত ধরতেই মিতা তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে বসলো।

আমার ওপরে রাগ করেছো মিতা?

হঠাৎ রাগ করতে যাবো কেন।

তবে?

অন্য সময় এসো সনৎ, শরীরটা বড় ক্লান্ত বোধ করছি, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো মিতা এবং সনৎকে দ্বিতীয় আর কোন কথার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কেমন যেন বিশ্রী একঘেয়ে লাগছে এ জীবন।

কোন অর্থ, কোন উদ্দেশ্যই যেন আর মিতা খুঁজে পাচ্ছে না। কেমন যেন ক্লান্ত অবসন্ন লাগে সর্বক্ষণই।

কোথায় যেন মনে হয় চেনা সুরটা হঠাৎ কেটে গিয়েছে।

কয়েক দিন আগে তার সর্বশেষ নতুন ছবি 'রাত হলো অনেক' শহরের চারটি হাউসে রিলিজ হয়েছে।

প্রত্যেকটি শো-ও হাউস ফুল যাচ্ছে।

চারিদিকে তার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা যাচ্ছে।

কত নতুন ও পুরাতন চেনা প্রডিউসাররা বাড়ি বয়ে তাকে কন্‌গ্র্যাচুলেশন জানাতে এসে তার দেখা না পেয়ে ফিরে গেছে এই দু'দিন ক্ষুন্ন মনে।

বাড়ি থেকেও মিতা আজকাল বড় বের হয় না।

দিবারাত্র নিজের শয়ন ঘরে শুয়ে থাকে না হয় বসে বসে অলস-ভঙ্গিতে কাটায়।

সেদিনও সন্ধ্যার পরে নিজের শয়ন ঘরে একটা সোফার ওপর বসেছিল হঠাৎ কি খেয়াল হতেই উঠে পড়লো।

এবং ফোনটা তুলে শহরের নাম করা একটা হাউসে কনেকশন চাইল।

সে হাউসেও তখন তার 'রাত হলো অনেক' চলছে।

হ্যালো চিত্রবাণী?

বলছি বলুন, ওপাশ থেকে জবাব এলো।

রাত সাড়ে নয়টার শো-র হায়ার ক্লাশের কোন টিকিট আছে?

চার টাকার টিকিট পাবেন।

মিস রয়ের নামে দুখানা সীট রাখবেন দয়া করে।

রাখবো।

মিতা ফোনটা নামিয়ে রাখলো৷ তারপর একটু পরেই আবার ডায়াল করে ফোনটা তুলে নিল।

হ্যালো, 'ক্যাফে দ্য মণিকো'!

ইয়েস!

আপনাদের অর্কেষ্ট্রার ভায়েলেনিসট্‌ মিঃ পার্থপ্রতিম চৌধুরী এসেছেন?

হ্যাঁ।

তাকে একটু অনুগ্রহ করে ডেকে দেবেন ফোনে।

কি নাম বলবো!

কোন নাম বলতে হবে না, বলুন, একজন ভদ্রমহিলা ডাকছেন।

আচ্ছা ধরুন, দেখছি।

৩

একটু পরেই ওপাশ থেকে পার্থর গলা ভেসে এলো, হ্যালো কে?

মিঃ চৌধুরী!

কথা বলছি! কে আপনি?

বলুনতো কে!

সাড়া নেই অন্য পাশ হতে।

মিষ্টি হাসির শব্দ তরঙ্গ একটা, তারপরই মৃদু নারী কণ্ঠস্বর আবার পার্থর কানে ভেসে এলো, কি চিনতে পারছেন না?

চিনলাম। কিন্তু কি ব্যাপার?

চিনেছেন, বলুনতো কে!

মিতা দেবী!

বাঃ এইতো দেখছি, সত্যি সত্যিই চিনেছেন! শুনুন, ঠিক ন'টা পনেরয় আপনার ওখানে আমি পৌছাচ্ছি, আমার সঙ্গে এক জায়গায় আপনাকে যেতে হবে।

কিন্তু আমার যে রাত এগারটা পর্যন্ত অর্কেস্ট্রায় প্রোগ্রাম রয়েছে বাজাবার।

একটা রাত না হয় রাত ন'টায় আমার জন্য ছুটি নিলেনই! পারবেন না!

তা ঠিক নয় তবে—

তবে আবার কি? আমি যাচ্ছি, প্রস্তুত থাকবেন।

শুনুন, মানে বলছিলাম—

কিন্তু অন্যদিকে মিতা তখন ফোন নামিয়ে রেখেছে।

আর্সীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করতে করতে গুণ গুণ করে আপন মনে গাইছিল তার প্রিয় গানটি, বকুল গন্ধে বন্যা এলো—

কাঞ্চি এসে ঘরে ঢুকলো, আমাকে ডেকেছিস?

হ্যাঁ রে শোন, আজ রাত্রে এখানে একজন খাবে, বাজার থেকে মাংস নিয়ে আয়, ভাল করে যেন রান্না করে।

কাঞ্চি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শাড়ী আর যেন পছন্দই হয়না মিতার।

রং পছন্দ হয়তো পাড় পছন্দ হয়না, পাড় হয়তো রঙটা শাড়ীর মনে ধরে না।

শেষপর্যন্ত অনেক বাছাবাছি করে কালো জরি-পাড় শাদা জমীনের একটা দামী সিল্কের শাড়ী ও কালো সিল্কের উপর সাদা জরির বুনোন একটা ব্লাউজও বেছে নিল।

শাড়ীটা পরে মাথায় তুলে দিল গুণ্ঠন!

মাথায় ইতিপূর্বে কখনো গুণ্ঠন দেয়নি মিতা, এই প্রথম।

ঠিক রাত সোয়া নয়টায় মিতার বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি এসে বিচিত্র শঙ্খ হর্ণের শব্দ তুলে কাফে দ্য মনিকো'র পেভ্‌মেণ্টের সামনে পার্ক করলো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কাচের দরজা খুলে হোটেল থেকে বের হয়ে এলো পার্থ।

আজ আর গাড়িটা চিনতে পার্থর কষ্ট হয় না।

সোজা সে গাড়ির সামনে আসতেই গাড়ির সামনের দরজা খুলে মিতা আহ্বান জানায়, আসুন—

গাড়ির মধ্যে উঠে বসতেই সেই পরিচিত সেণ্টের গন্ধটা এসে পার্থর নাকে ঝাপ্‌টা দেয়।

গাড়ি ছেড়ে দেয় মিতা।

এদিক ওদিক খানিকটা অনির্দিষ্টভাবে ঘুরে অবশেষে মিতা গাড়ি এনে পার্ক করলো রাত পৌনে দশটা নাগাদ চিত্রবাণী হাউসের সামনে।

বসুন, আসছি—

মিতা গাড়ি থেকে নেমে চলে গেল।

সামনেই বিরাট ব্যাপার। ব্যানারে মিতা রায়ের বিচিত্রভঙ্গির মনোহারিণী বিরাট একটি মুখ আঁকা রয়েছে।

তার উপরে নিওনে লেখা ঃ রাত হলো অনেক।

একটু পরেই মিতা ফিরে এসে বললে, চলুন!

গাড়ি থেকে নেমে তাকালো মিতার দিকে পার্থ।

কিন্তু গুণ্ঠনের তলায় মিতার মুখ ঢাকা পড়েছে।

নিঃশব্দে মিতাকে অনুসরণ করে পার্থ হলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো। অন্ধকার ঘরে তখন স্ক্রিনে নিউজ শেষে ইণ্টারভ্যালের পরে ছবির টাইটেল পড়েছে।

নির্দিষ্ট সীটে গিয়ে বসলো দু'জনে পাশাপাশি।

রূপালী পর্দায় বিরাট দুটি নাম সর্বপ্রথম ভেসে ওঠে। মিতা ও কৃষ্ণকুমার অভিনীত, রাত হলো অনেক।

অপূর্ব লাস্যময়ী অভিনেত্রী মিতা রায় যেন কল্পনা দিয়ে গড়া, সৌন্দর্যের তিলোত্তমা।

ক্বচিৎ কখনো সিনেমা দেখে পার্থ।

অবাক বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে দেখছিল সে মিতার অভিনয়। আর যত

দেখছিল ততই যেন মনের মধ্যে কোথায় একটা অস্বস্তির কাঁটা কিচ্‌ কিচ্‌ করে বিঁধছিল।

বেশভূষা ও অঙ্গভঙ্গি, হাসি ও চাহনির ভিতর দিয়ে অভিনয়ের যে যে মুহূর্তের মিতার যৌন আবেদন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সেইগুলোই যেন পাথর কুৎসিত মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল রুচির বিকার।

কেমন লাগছে?

ভাল না!

সমস্ত হাউস তখন থেকে থেকে উল্লাস জানাচ্ছে!

মিতা যেন পার্থর কথায় চমকে ওঠে। বলে, ভাল না!

না।

কেন?

আপনার চোখ থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন ছবির প্রডিউসার টাকা দিয়ে আপনার নগ্ন দেহের আবেদনকে কি জঘন্য ও বিশ্রীভাবে একস্‌প্লয়েট করেছে। এ রেস্‌পনস্‌ আপনার অভিনয়ের নয়, নগ্ন দেহের—

পার্থর কথাটা শুধু রূঢ়ই নয় রীতিমত যেন আঘাতও করে মিতার মর্যাদাবোধে।

তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ে বলে, চলুন—

শেষ পর্যন্ত দেখবেন না?

না, চলুন—

অন্ধকারেই দুজনে হাউস থেকে বের হয়ে এলো।

ইতিপূর্বে দু একটা কাগজে এই ধরনের ঠিক না হলেও স্পষ্টাস্পষ্টি অনুরূপ ইংগীত দিয়ে বিশ্লেষণ মিতার করেনি তা নয়।

কিন্তু মুখের উপরে কেউ তাকে এমনি নিষ্ঠুর বিশ্লেষণে আঘাত করতে পারে এ যেন মিতার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

শুধু আঘাতই নয় বিশ্লেষণের দ্বারা অভিনেত্রী জীবনে আজ যেখানে তার সব চাইতে বড় স্বীকৃতি এবং যেটা সে মুখে না স্বীকার করলেও মনে মনে স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না, সেইখানেই আজ পার্থ তাকে আঘাত করেছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও রূঢ়ভাবে।

গাড়িতে এসে উঠে বসে গাড়ি ছাড়তেই পার্থ শুধালো, কি হলো অমন করে অর্ধেক বই হতে না হতেই উঠে এলেন কেন?

আমি তো দেখতে যাইনি, আপনাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তা আপনারই যখন ভাল লাগছিল না—

কে বললে আমার ভাল লাগেনি!

কেন, আপনিই তো বললেন!

আমি বলেছি!

বলেন নি? কুৎসিত, জঘন্য—

হ্যাঁ, বলেছি কিন্তু সেটা তো আপনার অভিনয়কে বলিনি, বলেছি ডাইরেক্টার ও ক্যামেরাম্যান আপনার দেহটাকে যে ভাবে চোখের সামনে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছে সেইটা সম্পর্কেই—

পার্থর শেষের কথাগুলোর জবাব দেয় না মিতা।

গত চারটে বছর ধরে চিত্রজগতে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে মিতা দিনের পর দিন শুনে এসেছে জনে জনের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই কেবল।

শুনে এসেছে তার দেহের প্রশস্তি, অভিনয়ের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথাই।

চাটুকার আর তোষামুদের দল তারা।

কোন না কোন স্বার্থ ব্যতীত যাদের আর কোন উদ্দেশ্যই নেই।

আর তাদের সেই উচ্ছ্বাসের কল্পনার স্বর্গে সে করেছে স্বচ্ছন্দ বিহার লঘু পক্ষ ডানা মেলে যেন।

কিন্তু পার্থ তো সে দলে পড়ে না।

আর সেটা বুঝতে পারেনি বলেই পার্থর সমালোচনাটা মিতাকে আঘাত করেছিল।

পার্থকে তার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি পৌঁছে মিতা গাড়ি থেকে নেমে নিজের বসবার ঘরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালো।

ঘরের মধ্যে বসে আছে সোফায় সনৎ বোস অর্থাৎ স্যান্টি!

সামনে টেবিলের ওপরে রক্ষিত বিচিত্র হাঙর-মুখ এ্যাসট্রেটা দগ্ধ সিগারেটের শেষাংশে ও ছাইয়ে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে।

কি ব্যাপার স্যান্টি? এত রাত্রে?

সনৎ অর্থাৎ স্যান্টি উঠে দাঁড়ালো। দু'চোখে তার কুটিল দৃষ্টি।

কোমরের বেল্ট বাধা দামী ট্রপিক্যালের অ্যাসকলারের ট্রাউজার, গায়ে দামী ক্রিমরংয়ের সিল্কের সার্ট, কব্জির উপরে হাতাটা গোটানো।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটায় একটা টান দিয়ে সনত বললে, হ্যাঁ—তোমারই অপেক্ষায় মিতা। অর্কেস্ট্রার ঐ ভায়ালনিষ্ট ছোকরাটাকে কবে থেকে পাকড়াও করলে?

তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যেন তাকালো মিতা সনতের দিকে।

কি ম্যাডাম্, জবাব দিচ্ছ না যে!

তুমি বোধহয় প্রকৃতিস্থ নও সনত্, ইউ বেটার গো হোম! তাছাড়া রাতও অনেক হয়েছে—

কথাগুলো বলে ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়ায় মিতা।

সনৎ বোস অন্যকে ড্রিঙ্ক করায়, নিজে ড্রিঙ্ক করে না অন্তত কথাটা তোমার অজানা তো নয়।

সনত?

কাকে চোখ রাঙাচ্ছো ম্যাডাম? সনৎ বোসকে বোধহয় আজো চেন নি!

সহসা যেন সনতের শেষের কথায় মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে মিতা। একেই পার্থের কথায় মনটা বিষণ্ণ ও বিক্ষিপ্ত হয়েছিল কিছুক্ষণ থেকে তার উপরে সনত বোসের ভদ্রতাবিরুদ্ধ ব্যবহার তাকে যেন মুহূর্তে একেবারে ক্ষিপ্ত করে তোলে।

কঠিন কণ্ঠে বলে মিতা, জানবো না কেন, খুব জানি। বাপের পয়সায় কাপ্তানী করে বেড়াচ্ছো কতকগুলো লোফার গুণ্ডা ক্লাসের বয়াটে ছোকরা জুটিয়ে—

তাই বুঝি! কিন্তু সুন্দরী, আর একটা কথা হয়তো জান না, যে মুখ আর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুমি চিত্রজগতে গ্ল্যামারের সৃষ্টি করেছো ও মুখ আর চোখ একটি অ্যাসিড্ বাল্‌ব দিয়ে এমন করে দিতে পারে সনত বোস, যে—

গেট্ আউট্, গেট্ আউট—

চিৎকার করে ওঠে মিতা।

চিৎকার আর চেঁচামেচি শুনে ততক্ষণে পাঞ্জাবী দরোয়ান বলবীর সিং পারলারে ছুটে এসেছে দরজার সামনে।

ইসকো ঘাড় পাকাড়কে আভি বাহার নিকাল দো বলবীর—

চিৎকার করে মিতা।

ও. কে.—সনত বোসের পরিচয় এবার তুমি ভাল করেই পাবে। ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী—কুলটা—

ঝড়ের মতই কথাগুলো বলে সনত বোস বের হয়ে গেল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে সোফার উপরে বসে পড়লো মিতা।

ঝর ঝর করে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ফিরতে এতো রাত হলো যে পার্থ।

মা মৃন্ময়ী এসে পাশে দাঁড়ালেন।

একি মা, তুমি এখনো জেগে আছো!

হ্যাঁ, কিন্তু এত রাত হলো যে ফিরতে!

সিনেমায় গিয়েছিলাম। তাছাড়া এমনি রাত করেই তো বরাবর আমি ফিরি মা। আজ তো নতুন নয়।

কদিন থেকেই একটা কথা তোকে বলবো বলবো ভাবছিলাম।

কি কথা মা!

আর কেন এবারে বিয়ে থা কর একটা!

তুমি তো সব জান মা!

জানি বলেই তো বলছি, সে মরীচিকার আশায় আশায় আর থেকে লাভটা কি—আর তা ছাড়া সেটা কি একটা বিয়ে?

মরীচিকা কিনা জানি না মা, আর ভিতরে যে ব্যাপারই থাক না কেন, তোমাকে তো আমি বলেছি, সেদিন তাকে সর্বান্তঃকরণেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলাম।

কোথায় থাকে, কি নাম ধাম পরিচয় গোত্র কিছুই জানিস না, টাকার লোভে পড়ে কাকে না কাকে গিয়ে হুট্ করে বিয়ে করে বসেছিলি। আমার তো মনে হয় ও কোন শয়তানের কারসাজী!

তবু সেই আমার স্ত্রী মা! এ জীবনে আবার তাকে খুঁজে পাই ভালই নচেৎ যতদিন পর্যন্ত না জানছি সে বেঁচে নেই বা মৃত ততদিন আর কাউকেই স্ত্রী বলে অন্তত আমি গ্রহণ করতো পারবো না মা।

এই নয় বছর ধরে তো কম খুঁজলি না। তাছাড়া সে যদি বেঁচেই থাকতো তবে কি একটা না একটা সন্ধান তার পাওয়া যেতো না ভাবিস?

আজো তেমন করে আর কোথায় তার খোঁজ করতে পারলাম মা!

কিন্তু আমিই বা আর কতদিন বাঁচবো পার্থ! এ শূন্য ঘরে আর মন বসে না। একমাত্র ছেলে তুই আমার, তোর বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনবো সে সাধও কি মিটবে না!

আর কিছুদিন তুমি অপেক্ষা কর মা! আমার ধারণা নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে, নিশ্চয়ই সে আমাকে খোঁজ করছে। তার সন্ধান আমি পাবোই!

মৃন্ময়ী আর কোন কথা বললেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

৪

সত্যিই কি তাহ'লে এই দীর্ঘ নয়টা বৎসর ধরে মিথ্যে এক মরীচিকার পিছনেই আশায় আশায় আজও দিন গুণছে সে।

কোন দিনই এ জীবনে তার সন্ধান আর সে পাবে না।

আশ্চর্য সেই রাতটি একটি স্বপ্নের মতই তার জীবনের পাতা থেকে চিরদিনের মতই মুছে গিয়েছে। সে তাকে ভুলে গিয়েছে একথা যেন মনে ভাবতেও পারে না।

মন যেন তার কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, সে তাকে সত্যি সত্যিই ভুলে যেতে পারে। আর এও তার মন বিশ্বাস করতে চায় না যে, সে আর বেঁচে নেই।

আছে। সে এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আজো বেঁচে আছে।

একদিন না একদিন তার সন্ধান সে পাবেই।

তার স্ত্রী! তার সহধর্মিনী!

মিথ্যা নয় তার জীবনের সেই আশ্চর্য রাতটি।

মিথ্যা নয় তার সেই স্ত্রী!

তার বধূ!

সেই আশ্চর্য রাতটি!

চোখ বুজলেই আশ্চর্য সেই রাতটি যেন স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করে ওঠে।

দু' জনারই ইচ্ছা ছিল সে রাতটি তারা ঘুমাবে না।

জেগেই দু'জনা রাতটা কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই দু'চোখে তার কি ঘুম যে নেমে এলো।

করুণ কণ্ঠে সে যখন বললে, বড় ঘুম পাচ্ছে যে!

সেও বলেছিল, আমারও। কিন্তু ঘুমাতে যে চাই না মীনু!

মীনু বলে, আমিও চাই না।

তবু কেউই তারা সে রাত্রে জেগে থাকতে পারেনি।

ঘুমিয়ে প'ড়েছিল তারা দু'জনাই!

তারপর ঘুম যখন ভাঙলো—

ঘড় ঘড় ঘড় একটা শব্দ কানে এসে বাজছে। দুলছে যেন সব কিছু! দোলায় শুয়ে শুয়ে পার্থও যেন দুলছে।

প্রথমটায় কিছুই বুঝতে পারে না। সব অস্পষ্ট ধোঁয়াটে!

ক্রমশঃ সেই ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে যেতে দেখলে অচেনা একটা বাড়ির ছোট অপরিসর একটা ঘরে লোহার একটা খাটের ওপরে সে শুয়ে আছে।

সেই আশ্চর্য রাত! তারপর সেখান থেকে অপরিচিত এই ঘরের মধ্যে সে এলো কি করে। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

বোধশক্তিটা যেন জট পাকিয়ে যায়।

একাকী একটা ঘরের মধ্যে সে শুয়ে।

দ্বিতীয় আর প্রাণী ঐ ঘরের মধ্যে নেই! খোলা জানালাপথে বাইরের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না পার্থ! কোথায় সে।

আর বুঝতে পারে না এখানেই বা সে এলো কি করে!

অনেক—অনেকক্ষণ ধরে যেন পার্থ ঘুমিয়েছে।

শরীর যেন শিথিল অবসন্ন।

তবু উঠে বসলো পার্থ! চারদিকে তাকালো। অপরিচিত ঘর। এ ঘর যেন কখনো দেখেনি।

লোহার খাটের উপর সাধারণ শয্যা, সেই শয্যার উপরই সে ঘুমিয়েছিল।

ঘরের খোলা জানালাপথে সকালের রোদ এসে পড়েছে ঘরে।

কত বেলা হয়েছে কে জানে।

নিজের বেশভূষার দিকে তাকালো। নতুন একটা তাঁতের ধুতি ও একটা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিধানে। খাট থেকে উঠে দাঁড়ালো পার্থ।

ঘরের দরজাটার দিকে অতঃপর এগিয়ে গেল। দরজাটা খুলতে গিয়েও কিন্তু খুলতে পারল না। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ! বোধ হয় শিকল তোলা।

কি ভেবে বার দুই দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

আপনার ঘুম ভেঙেছে! দু-বার এসে ইতিমধ্যে আমি দেখে গিয়েছি! আপনি ঘুমাচ্ছিলেন। একটু অপেক্ষা করুন আপনার নামে একটা চিঠি আছে। সুবোধবাবু আপনাকে দেবার জন্য বলে গেছেন।

সুবোধ কোথায়?

তাতো জানি না! কাল রাত্রে আপনাকে এখানে রেখে চলে গেছেন।

এ বাড়িটা কার?

রথীনবাবুর।

রথীনবাবু কে?

মস্ত বড় ব্যবসায়ী লোক! মস্ত ধনী!

আপনি বুঝি এখানে থাকেন?

হ্যাঁ, এ বাড়ির দেখাশোনা আমি করি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন চিঠিটা এনে দিচ্ছি আমি।

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে আবার পার্থ খাটের উপর বসলো।

একটু পরেই ভদ্রলোক একটি মুখ আটা খাম এনে পার্থর হাতে দিলেন।

খামটা হাতে করে নিয়ে পার্থ সেটা পকেটে রাখতে গিয়েও কি ভেবে আবার সেটার মুখ ছিঁড়ে খুলতেই ভিতর থেকে একশত টাকার দুইখানি নোট ও ছোট একটা চিঠি বের হয়ে এলো।

প্রথমেই চিঠিটা পড়লো পার্থ।

প্রিয় পার্থ,

তোমার বাকী দুইশত টাকা এই চিঠির সঙ্গে খামের মধ্যে রেখে দিলাম। এই চিঠি যে তোমাকে দেবে তাকে বললেই সে তোমাকে একটা গাড়ি ডেকে দেবে। রাত্রে তোমাকে নেশার দ্বারা ঘুম পাড়িয়ে এখানে তোমার অজ্ঞাতে সরিয়ে আনবার জন্য আমি দুঃখিত। এর প্রয়োজন হতো না কিন্তু মেয়ে দেখে যে তোমার মাথা ঘুরে যাবে আর তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবে এটা ভাবতে পারিনি। অনোন্যপায় হয়েই এই ব্যবস্থা রাতারাতি অবলম্বন করতে হয়েছে। আর একটা কথা—গত রাত্রের কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করো। কারণ ওটা একটা বিয়েই নয় এবং ও বিয়ে সমাজ বা আইন কোন দিনই স্বীকার করবে না। ইতি—

সুবোধ

গাড়ি ডেকে দেবো?

দরকার হবে না। বলে পার্থ ঘর থেকে বের হয়ে এলো।

ভদ্রলোকই তাকে বাড়ি থেকে বের হবার পথটা দেখিয়ে দিলেন।

কলকাতা শহরেই টালীগঞ্জ অঞ্চলে বাড়িটা একটু ভিতরের দিকে। এবং খানিকটা হাঁটতেই বড় রাস্তা পাওয়া গেল।

অত্যন্ত পিপাসা পেয়েছিল। একটা ছোট চায়ের দোকানে ঢুকে চা দিতে বললো পার্থ। নিম্ন শ্রেণীর কয়েকটি লোক দোকানে বসে চা পান করছিল।

পার্থকে অমন পরিষ্কার বেশভূষায় দোকানে ঢুকতে দেখে তার দিকে তাকালো।

চা পান করে পকেট থেকে পয়সা বের করে দিয়ে আবার পথে এসে নামল পার্থ।

মেসে ফিরে এলো বেলা এগারটা নাগাদ।

চিৎপুর অঞ্চলে গলির মধ্যে অন্ধকার একটা মেসে সে সময় থাকতো পার্থ।

মেসে এসে প্রথমেই পার্থ সুবোধের খোঁজ করলো কিন্তু ভৃত্যের কাছে শুনলো, আগের দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে নাকি সুবোধ মেসের পাওনা গণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

কোথায় গিয়েছে কেউ কিছু বলতে পারলো না।

স্নান সেরে কিছু মুখে দিয়ে পার্থ আবার শয্যার উপরে এসে শুয়ে পড়লো।

নতুন করে যেন গত রাত্রের ব্যাপারটা সে ভাববার চেষ্টা করে।

সমস্ত ব্যাপারটা যেন আগাগোড়া একটা স্বপ্ন।

পকেট থেকে সুবোধের চিঠিটা বের করে আবার পড়লো।

সুবোধের সঙ্গে তার আলাপ এই মেসেই বছরখানেক আগে!

•

বছরতিনেক আগে গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পরই মামা তাকে ডেকে বলে, আর তার ভার তিনি বইতে পারবেন না। নিজের ব্যবস্থা সে এবারে নিজে করলেই ভাল হয়। তবে যতদিন না সে একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিতে পারে, তার মা তার কাছেই থাকতে পারে।

অগত্যা তার কয়েকদিন পরেই পার্থকে বের হয়ে পড়তে হয়।

দশটি টাকা ও বেহালার বাক্সটি নিয়ে চলে আসে পার্থ কলকাতায়। দশটি টাকা মাত্র সম্বল নিয়ে কোন হোটেলে ওঠা যায় না। আর উঠলেও দু'তিন দিনের বেশি সেখানে থাকা চলবে না।

এবং শুধু তো তাই নয়। ঐ দশটি টাকাই তো মাত্র সম্বল। শেষ হয়ে গেলে তখন কিসে চলবে তার।

পাইস হোটেলে একবেলা খায়, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে শুয়ে রাত কাটায় এবং সারাটা দিন চাকরি ও আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় পার্থ।

অপরিচিত শহর, কেউ তাকে চেনে না, কোন সুপারিশ পত্রও নেই, কে দেবে এই শহরে তাকে চাকরি আর কেই বা দেবে তাকে আশ্রয়।

ক্রমে হাতের সম্বল দশটি টাকাও ফুরিয়ে আসে।

চোখে অন্ধকার দেখে পার্থ!

ঐ সময় একদিন শ্যামবাজার অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে মায়ের দূরসম্পর্কীয় ভাই নকুড় মামার সঙ্গে পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল পার্থর।

৫

পার্থর নকুড় মামা যাত্রার দলে চাকরি করেন।

যাত্রার দলে অভিনেতা।

দেখতে কালো হলেও বেশ সুন্দর চোখ মুখের গঠন ও চেহারা।

মাথায় বাবরী চুল।

যাত্রার দলে ভাল ভাল পার্ট অভিনয় করেন।

অভিনয়ে নামও আছে যথেষ্ট।

অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই,—প্রথমটায় চিনতে পারেননি নকুড় মামা পার্থকে। কিন্তু পার্থ যখন নকুড়চন্দ্রের পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, আমাকে চিনতে পারছেন না নকুড় মামা! আমি পার্থ! পলাশডাঙার—

আরে, আরে—আমাদের মৃন্ময়ীর ছেলে না তুই!

আজ্ঞে হ্যাঁ—

তা এখানে কি করছিস?

একটা চাকরির চেষ্টায় ঘুরছি!

চাকরি! চাকরি কি গাছের ফল যে আঁকসী দিয়ে পেড়ে নিবি! তা আছিস কোথায়?

রাস্তায় রাস্তায়ই ঘুরছি—

তা হতভাগা আমার ওখানে যাসনি কেন! চ, চ—

নকুড় মামার সঙ্গেই তার বেনেটোলার বাড়িতে গিয়ে উঠলো পার্থ।

নকুড় মামা একা লোক বিয়ে থা করেন নি। বাসায় লোকজনের মধ্যে একজন চাকর ও ঠাকুর।

ছোট একটা বাড়ির নিচের তলায় তিনখানা ঘর নিয়ে নকুড় মামা থাকেন।

যাত্রা দলের অভিনয় করলেও আয় নেহাৎ খারাপ করেন না। তবে খুব বেশী শৌখীন প্রকৃতির ও খাইয়ে লোক বলে যত্র আয় তত্র ব্যয়।

নকুড় মামার ওখানেই আশ্রয় পেল পার্থ!

কিন্তু মাস দুই চলে গেল, চাকরির আর কোন সুবিধাই হয় না।

সামনেই পূজা আসছে।

নকুড় মামার 'শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি'র নতুন বইয়ের মহলা চলছে পুরোদমে, দিবারাত্র বেশীর ভাগ সময়ই নকুড় মামা রিহার্শালের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কখন আসেন কখন যান কিছুই ঠিক থাকে না।

পার্থর সঙ্গে বড় একটা দেখাও হয় না।

সেদিন সারাটা দ্বিপ্রহর চাকরির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে পার্থ সবে এসে বিছানায় শুয়ে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজেছে, দরজার গোড়ায় নকুড় মামার স্বর শোনা গেল, পার্থ ঘরে আছিস নাকি!

হ্যাঁ মামা।

নকুড় মামা ঘরে এসে ঢুকলেন।

কিরে চাকরি টাকরির কোন সুবিধা হলো!

না।

তা এক কাজ কর না!

কি মামা?

তুইতো দেখি চমৎকার বেহালা বাজাস!

রাত্রে মধ্যে মধ্যে পার্থ বেহালা বাজাতো,—বোধহয় তাই শুনে থাকবেন মামা।

পার্থ বলে নিম্নকণ্ঠে, সামান্য একটু আধটু বাজাই—

পার্ট-টার্ট করা অভ্যেস আছে?

পার্ট!

হ্যাঁ রে, অভিনয়।

স্কুলে দু একবার রিসাইটেশন করেছি!

চেহারা আছে গলা আছে ওতেই হবে, নে ওঠ দেখি—চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

এবারে আমরা স্বর্ণলতা অভিনয় করছি। যে ছোকরা নীলকমলের রোল করছিল কাল সে চাকরিতে জবাব দিয়ে চলে গিয়েছে। তুই যদি ঐ পার্টটা করে দিতে পারিস তো একটা হিল্লে হয়ে যাবে!

কিন্তু মামা—

কি হলো, যাত্রার দলে চাকরি বুঝি মন উঠ্ছে না।

না তা নয়। কিন্তু আমি কি পারবো?

পারবি না মানে, আলবৎ পারবি। আমার ভাগ্নে না তুই! নে ওঠ্—

একপ্রকার জোর করেই যেন ধরে নিয়ে গেল পার্থকে নকুড় মামা রিহার্শেলে।

দলের ম্যানেজার শশিকান্ত পার্থর চেহারা ও গলা শুনে ভারি খুশী।

সঙ্গে সঙ্গে চাকরি হয়ে গেল পার্থর।

সিজনে মাসে পঞ্চাশ টাকা ও অফ সিজনে ত্রিশ টাকা মাস মাস।

পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে
আমি যাবো পদ্মবনে—

বেহালায় হাতটিও ছিল মিষ্টি এবং গলাও ছিল সুরেলা পার্থর।

পার্থর গান আর বাজনা সেই সঙ্গে অভিনয় দর্শকজন 'বাহবা' 'বাহবা' করে ওঠে। মাস পাঁচেক ধরে পার্থ শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টির সঙ্গে কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বহরমপুর, নানা জায়গায় অভিনয় করে একদিন আবার কলকাতায় ফিরে এলো।

কিন্তু ঐ জীবন ভাল লাগে না পার্থর।

ইতিমধ্যে হাতেও কিছু জমে গিয়েছে। পার্থ আবার নতুন করে চাকরির সন্ধানে ফিরতে লাগলো।

এবং ঐ সময়ই যাত্রার দলের এক বাজিয়ে বন্ধুর সাহায্যে শহরে এক থিয়েটারে বেহালাবাদক হিসাবে যন্ত্র-সংগীতের দলে মাস মাস সত্তর টাকা মাইনাতে চাকরি পেয়ে গেল পার্থ!

এবং থিয়েটারে যন্ত্র-সংগীতের দলে চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত দিন পরে সত্যিকারের মনপ্রাণ যেন ঢেলে দেয় পার্থ তার সুরের সাধনায়।

নামকরা একজন বেহালাবাদকের কাছে গিয়ে সে অবসর সময়ে শিক্ষা নিতে থাকে।

বেহালা বাদক মিঃ রবিনসন, ক্রিশ্চান।

যথেষ্ট বয়েস হয়েছে।

পার্থর হাতের কাজ ও তার নিষ্ঠা দেখে তাকে সাগ্রহে নিজের কাছে যেন টেনে নিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য—রবিনসন, হঠাৎ মারা গেলেন, শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল পার্থর।

পার্থর ইচ্ছা আরো সে শিক্ষা নেয় কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের সন্ধান পায় না।

ঐ সময়েই মামার আশ্রয় ছেড়ে চিৎপুরে গলির মধ্যে একটা মেসহোটেলে এসে আশ্রয় নেয় পার্থ।

সেইখানেই সুবোধের সঙ্গে তার একদিন আলাপ হয়।

ঐ সময় একদিন পার্থ শোনে পার্ক সার্কাসে নামকরা এক বৃদ্ধ বেহালাবাদক আছেন, ইহুদি।

একদিন তার সঙ্গে সন্ধ্যার পরে গিয়ে দেখা করলো পার্থ। কিন্তু তিনি একটি বৎসর শিক্ষা দেবার জন্য দুই হাজার টাকা চেয়ে বসলেন।

অনেক কাকুতি মিনতি করায় শেষটায় এক হাজারে স্বীকৃত হলেন, পাঁচশ টাকা অগ্রিম দিতে হবে।

কিন্তু অত টাকা পার্থ এক সঙ্গে পাবে কোথায়!

যা রোজগার করে তা থেকে ত্রিশটি করে টাকা দেশে মাকে পাঠায়, বাকী টাকায় কোন মতে তার নিজের খরচ চালায়।

নকুড় মামার কাছে একদিন গেল পার্থ। কিন্তু যাত্রার দলের কাজটি ছেড়ে দেওয়ায় পার্থর উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না নকুড় মামা।

সেখানে কোন সুবিধা হলো না।

টাকাটার জোগাড় যখন সম্ভব নয় তখন শিক্ষা নেওয়ার আশাও সুদূরপরাহত।

এমন সময় সুবোধ একদিন তাকে এসে বললে, একটা কাজ করে দিতে পারো পার্থবাবু!

কি কাজ?

কাজটা অবিশ্যি বিশেষ এমন কিছুই নয়! তবে সে জন্য কিছু তোমার প্রাপ্তিযোগ ঘটবে।

কাজটা কি শুনি?

বিশেষ কিছুই নয়, একজনকে নিয়ে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান বলতে পারো—মেকী বিয়ে করতে হবে!

মেকী বিয়ে, তার মানে!

বললাম তো একটা লোক-দেখানো এলেবেলে অনুষ্ঠান মাত্র।

ক্ষেপেছো, নিজেরই পেটের ভাত কখন জুটবে কখন জুটবে না, তার উপর আবার একটা বিয়ে।

আরে, বললাম তো এলেবেলে বিয়ে! স্রেফ ঐ একটা রাত্তিরেরই ব্যাপার। তারপর আর তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকবে না তার!

এমন হয় নাকি? কি যে সব আবোল-তাবোল বল সুবোধ।

শোন পার্থ, তারা শুধু বিয়ের নাম মাত্র একটা অনুষ্ঠানই চায় এবং সেজন্য একজন পাত্রের দরকার—সেই কাজটুকুই তোমাকে করে দিতে হবে।

সে তো তুমিও করে দিতে পারো।

না হে! আমি তাদের চেনা জানার মধ্যে! আমার দ্বারা হবে না। তাছাড়া লোকটা আমাকে দেখতে পেলে হয়তো গোলমাল বাধাবে।

না ভাই ক্ষমা করো। ওসব আমার দ্বারা হবে না। শুনেই মনে হচ্ছে যেন কেমন গোলমালে ব্যাপার।

ভেবে দেখো, নগদ শ'তিনেক টাকা পেয়ে যেতে অথচ সত্যিই কোন ঝামেলার ব্যাপার ছিল না।

না ভাই!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয় পার্থর ক্ষতিটাই বা কি! নগত শ' তিনেক টাকা পাওয়া যেতো, পরক্ষণেই আবার মনে হয়, কে জানে ব্যাপারটার মধ্যে কি সব গোলমাল আছে?

এলেবেলে বিয়ে আবার হয় নাকি?

শেষ পর্যন্ত হয়তো ঐ এলেবেলে বলে ফাঁকতালে একটা বৌ ঘাড়ে এসে চেপে বসবে।

তখন একুল ওকুল দুকুলই যাবে!

সাধ করে কে গোলমালের মধ্যে মাথা গলাতে যায়।

কিন্তু কথাটা যতই ভাবে পার্থ সুবোধের প্রস্তাবের অন্য দিকটাও তার মনে লোভ যে জাগায় না তাও নয়।

আবার মনে হয় এমন খেলা খেলা বা মিথ্যে মিথ্যে বিয়ে হয় নাকি, না কখনো হতে পারে?

তবে আজব শহর এই কলকাতা। এখানে কি যে হয় আর কি যে না হয় কেউ বলতে পারে না!

সুবোধকে ব্যাপারটা ভালো করে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন!

পরের দিনই পার্থ সুবোধকে শুধালো, আমাকে ব্যাপারটা একটু সত্যিকার বুঝিয়ে দেবে সুবোধ।

সে তো সেদিনই তোমাকে বললাম, কোন ঝক্কি নেই এর মধ্যে। সত্যি সত্যিই কিছু আর বিয়ে নয়, বিয়ের একটা অনুষ্ঠান মাত্র! একটা কুসংস্কার মাত্র!

কিন্তু এমন হয় নাকি!

হয়। যারা করাতে চাইছে তাদের মধ্যে হয়।

কিং রকম?

এ হচ্ছে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের ব্যাপার! সব তোমাকে পরে বুঝিয়ে

বলবো। তবে এটুকু জেনে রাখো তারা নিজেরাও যেমন এমনকি মেয়েটিও যেমন তোমাকে কোন দিনই তার স্বামী বলে স্বীকৃতি দেবে না, তেমনি আইনও কোন দিন তোমাকে দাবী মেনে নিতে বাধ্য করাতে পারে না। বললাম তো কুসংস্কারজাত একটা অনুষ্ঠান।

বেশ, আমি রাজি আছি! তবে পাঁচশ টাকা আমি চাই!

বেশ আমি তাহলে পরে তোমাকে জানাবো, সুবোধ বললে।

দিন দুই পরে সুবোধ এসে বললে—তাই হবে, পাঁচশ টাকাই সে পাবে।

আমাকে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হবে।

তাই হ—বে। সুবোধ জবাব দেয়।

নির্দিষ্ট দিন. রাত্রি নয়টা নাগাদ সুবোধ একটা ট্যাক্সীতে চাপিয়ে পার্থকে সরোজিনীর গৃহে নিয়ে চললো।

সারাটা পথ পার্থ এমনই অন্যমনস্ক ছিল ট্যাক্সী কোথা দিয়ে কোন পথ ধরে যাচ্ছে সেদিকে কোন নজরই দেয় না এবং অন্ধকারে ট্যাক্সীর থেকে নেমেও জায়গাটা চিনতে পারে না কারণ ঐ পল্লীতে ইতিপূর্বে কোন দিনই পার্থ আসেনি।

৬

সুবোধের সঙ্গে তারপর দীর্ঘ তিন মাস আর দেখা হয়নি পার্থর!

কিন্তু যে টাকার জন্য পার্থ ঐ কাজ করলো সেই টাকাই যেন পার্থর কাছে আজ মিথ্যে হ'য়ে গেল।

কোন কিছুই যেন আর ভাল লাগে না পার্থর।

থিয়েটারে যায়। নিজের কাজটুকু হয়ে গেলেই আবার চলে আসে, তারপর ক্ষীণ স্মৃতির অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে সারাটা কলকাতা শহর ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সেই মেয়েটির খোঁজে।

তার মিথ্যে মিথ্যে বিয়ে করা স্ত্রীর খোঁজে।

কানে আসে সেই কণ্ঠস্বর।

কি নাম তোমার?

মিনতি! ডাক নাম মীনু।

আবার কখনো কখনো কানে আসে সেই কথাগুলো ঃ

আপনি, আপনি—কি তাহলে আমাকে ত্যাগ করে আবার বিয়ে করবেন?

না মীনু, তোমাকে দেখবার আগে আমার মনে যাই থাক না কেন, আজ থেকে তুমিই আমার স্ত্রী। জেনো আর কখনো দ্বিতীয় নারী আমার জীবনে আসবে না।

শেষ পর্যন্ত একদিন চাঁদনীতে অকস্মাৎ সুবোধের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পার্থর।

এই যে সুবোধ!

তারপর পার্থবাবু, কেমন আছেন?

ভাল, এ কয়মাস আপনি ছিলেন কোথায়!

জানেন তো এক টোব্যাকো কম্পানীর ভ্রাম্যমাণ সেলিং এজেন্ট আমি, হঠাৎ আসাম চলে যেতে হয়েছিল—

ও, তা চলুন না ঐ চায়ের দোকানটায়, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

বেশ তো চলুন।

দুজনে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলো এবং পার্থই দু'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। চা পান করতে করতে একসময় পার্থ বলে, একটা কথা বলবো সুবোধবাবু, কিছু মনে করবেন না তো।

না, না—বলুন না।

সেই মেয়েটির নাম ধাম ঠিকানা আমি চাই!

কার বলুন তো। কোন্ মেয়েটির। একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই যেন তাকায় সুবোধ পার্থর মুখের দিকে। ব্যাপারটা যেন সে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারে না।

ঐ যে মাসতিনেক আগে এক রাত্রে যার সঙ্গে আমাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার হো হো করে হেসে ওঠে সুবোধ।

পার্থ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে সুবোধের মুখের দিকে, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, হাসছেন যে?

হাসবো না। সেই সুন্দর মুখটি বুঝি আজও ভুলতে পারেন নি পার্থবাবু! তা আপনার দোষ দেওয়া যায় না। ছুকরির চেহারাটা—

সুবোধবাবু! চাপা কণ্ঠে গর্জে ওঠে পার্থ।

কি হলো? তা did you enjoy that night! বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাঁকাভাবে সুবোধ তাকালো পার্থের মুখের দিকে, না চেয়ে চেয়ে মুখপানে—

ছিঃ সুবোধবাবু—

আরে মশাই ব্যাপারটা এখনো তাহ'লে বুঝতে পারেন নি!

কি?

ও তো বারবণিতাদের একটা কুসংস্কারজনিত অনুষ্ঠান মাত্র।

বারবণিতা!

হ্যাঁ!

তাহলে সেই মেয়েটি—সরোজিনীর বাবু রথীনবাবুর।

তা জানি না, তবে সরোজিনীর কাছেই শুনেছিলাম মেয়েটিকে নাকি ছোটবেলায় তারা প্রয়াগের মেলায় কুড়িয়ে পায়।

তবে, তবে তো সে বেশ্যার মেয়ে নয়!

নয়ই যে তাই বা কি করে বলা যায়!

কেন! এই তো বললেন তাকে প্রয়াগের মেলায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল।

হ্যাঁ তাই। তবে কি জাত কি গোত্র কার মেয়ে কিছুই তো জানা নেই, অজ্ঞাত অপরিচিত। কিন্তু তার খোঁজ আর কেন। এতদিনে হয়তো পাকাপোক্তভাবে সে দেহ-পসারিনী হয়ে উঠেছে।

না! মিনতি তা কখনো করতে পারে না।

আরে মশাই না পারলেই কি হবে নাকি! সরোজিনী আছে না—রথীনবাবু আছে না।

আপনি আমাকে তার ঠিকানাটা বলে দেন।

কেন যাবেন বুঝি সেখানে!

হ্যাঁ!

বেশ। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন জায়গাটা ভদ্রলোকের যাতায়াতের পক্ষে সুবিধার নয়।

তা হোক!

তবু যাবেন?

হ্যাঁ, যাবো।

মশাই, পাড়াটা সত্যিই ভাল না। তা ছাড়া সরোজিনীকে আমি জানি, হাতে ওর অনেক গুণ্ডা আছে। হয়তো মারধোরও খেতে পারেন। কেন ভদ্রলোকের ছেলে ওসব ঝামেলার মধ্যে যাবেন মশাই।

ঠিকানাটা আপনি দিন সুবোধবাবু!

যাবেনই তাহলে?

বললাম তো আপনাকে।

বেশ তবে ঠিক হয়ে থাকবেন, কাল সন্ধ্যার পর আমি পৌঁছে দেবো আপনাকে। ঠিকানা দিলেও আপনার মত লোকের পক্ষে সে জায়গা চিনে যাওয়া সম্ভব হবে না। আপনি সেই মেসেই আছেন তো?

হ্যাঁ!

যাবো'খন আমি সন্ধ্যায়।

সেই পাপ পুরীতে মাত্র দুটো রাত পার্থ গিয়েছিল।

সুবোধই তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। এবং সেখানকারই একটি মেয়ে, লতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল সুবোধ।

লতার কাছেই পার্থ মিনতির ইতিহাসটা জানতে পারে।

প্রথমটায় লতা কিছুই বলতে চায়নি। তারপর কি জানি কেন পার্থর অনুরোধ সে ঠেলতে পারেনি।

আপনি আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনেছেন শুনলে বাড়িউলি মাসী আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে বাবু—

তোমার ভয় নেই। একথা কোন দিন কাউকে আমি বলবো না যে তোমার কাছ থেকেই সব আমি জেনেছি।

লতা ব্যাপারটা জানতো। তার মুখ থেকেই পার্থ মিনতির সত্যিকারের ইতিহাসটা জানতে পারে।

লতা বলেছিল, ও মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই আমি বুঝেছিলাম বাবু, সে আমাদের দলের নয়। তাইতো অমন করে দোতলা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

তারপর আর কোন খবর তোমরা জান না লতা?

না। পুলিশের ভয় আছে না। কেঁচো খুঁড়তে হয়তো সাপ বেরুবে, এরা নিজে থেকে চুপ করে গিয়েছে।

আচ্ছা কোথায় সে যেতে পারে বলে মনে হয় লতা!

তা বলতে পারি না বাবু, তবে এটুকু হলফ করে বলতে পারি খারাপ রাস্তায় সে যায়নি।

তারপরও কি কম খুঁজেছে পার্থ মিনতিকে। কিন্তু তার কোন সন্ধানই

আর পায়নি। সেই ইহুদী ওস্তাদের কাছে আর বেহালার শিক্ষা নেওয়াও পার্থর হয়নি।

সেই পাঁচশত টাকা প্রাণে ধরে সে খরচ করতে পারেনি।

সযতনে একটা খামের মধ্যে ভরে বাক্সর তলায় রেখে দিয়েছে। আরো তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে, বেহালা বাজিয়ে এখন পার্থ ভালই রোজগার করে।

বাড়ি ভাড়া করে মাকেও নিয়ে এসেছে। কিন্তু জীবনের হঠাৎ আসা সেই আশ্চর্য রাতটির কথাও যেমন ভুলতে পারেনি তেমনি ভুলতে পারেনি সেই মেয়েটিকে, মিনতিকে। কেন যেন মনে হয় আজো পার্থর, মিনতির সন্ধান সে আবার একদিন পাবেই! মিনতি হারিয়ে যায়নি।

তার জন্য জীবনের বাকী কটা দিন যদি তাকে অপেক্ষা করতে হয়ও সে অপেক্ষা করবে।

সে যে তাকে কথা দিয়েছিল, তার জীবনে সেই একমাত্র নারী।

সেই তার স্ত্রী, সত্যিকারের সহধর্মিনী!

সে রাত্রের মন্ত্রের মধ্যে ফাঁকি থাক আর যাই থাক, সে রাত্রে সে যখন মিনতিকে কথা দিয়েছিল সমস্ত অন্তর দিয়ে সে কথা দিয়েছিল।

তার জীবনে দ্বিতীয় কোন নারীরই আর আবির্ভাব ঘটতে পারে না।

সেদিন কি একটা পর্ব উপলক্ষে ছুটি।

মা গিয়েছেন গঙ্গাস্নানে। পার্থ একা একা ঘরের মধ্যে বসে বেহালায় একটা নতুন সুর সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে।

সিঁড়িতে খট্ খট্ জুতোর শব্দ শোনা গেল।

অনীতার ভাইয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সোজা ওপরে চলে যান পার্থদা তার ঘরে বসে বাজাচ্ছেন, ঐ শুনুন—

পরক্ষণেই পার্থ যেন ভূত দেখার মতই চম্‌কে ওঠে।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মিতা।

একি! আপনি—

হ্যাঁ, মহম্মদ তো আর পর্বতের কাছে যাবে না, তাই পর্বতকেই মহম্মদের কাছে আসতে হলো। মৃদু হেসে কথাটা বলতে বলতে মিতা এসে ঘরে প্রবেশ করলো।

অতি সাধারণ বেশভূষা আজ পরিধানে মিতার।

সাধারণ কালো পাড় একটি তাঁতের শাড়ী, গায় তদ্রূপ একটি সাধারণ সাদা ব্লাউজ, মাথায় ঈষৎ গুণ্ঠন তোলা।

চোখে মুখে কোথাও প্রসাধনের চিহ্নমাত্রও নেই।

হাতে একগাছি করে সোনার কঙ্কণ।

পায়ে সাধারণ চপ্পল।

পার্থ নির্বাক।

বসতেও বুঝি বলবেন না! সত্যি, একেই বলে বরাত। অন্য কোথাও গেলে এতক্ষণ হয়তো মিতা দেবীকে কোথায় বসাবে, কি তাকে নিয়ে করবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠতো অথচ সেধে এলাম আপনার এখানে, আপনি এখন পর্যন্ত একবার বসতেও বললেন না।

আপনার মত ধনী, সর্বজনবন্দিতার খেয়াল হয়েছে এই গরীব নগণ্যের ঘরে এসেছেন কিন্তু কোন দুঃসাহসে আমি আপনাকে বসতে বলি বলুন তো!

তাই বুঝি!

কথাটা কি মিথ্যে, আপনিই বলুন।

তাই বুঝি সসম্ভ্রমে এখনো আপনি বলে সম্বোধন করেন! কথাটা বলে আর অপেক্ষা না করে মিতা ঘরের মধ্যে যে ছোট টুলটি ছিল সেটার উপরেই বসে পড়ে।

আপনার বুঝি আজ সুটিং নেই!

সুটিং বুঝি রোজ থাকে। তাছাড়া বড় অভিনেত্রী আমরা ; ডেট্ চাইলেই কি ডেট্ পাওয়া যায় নাকি! কিন্তু ওসব সুটিংয়ের গল্প করতে আপনার কাছে আসিনি!

তবে কি জন্য এসেছেন!

সাধারণ ঘরোয়া গল্প বলতে শুনতে! আপনার মা কোথায়?

মা!

হ্যাঁ, চলুন না তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন।

মা তো বাড়িতে নেই, গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছেন।

ও, তা অনীতা দেবী! তার সঙ্গেই না হয় একটু আলাপ করিয়ে দিন।

সেও মার সঙ্গে গিয়েছে।

তাহলে আর কি হবে উঠি! আচ্ছা চলি নমস্কার—

যেমন এসেছিল মিতা তেমনিই বের হয়ে গেল।

৭

দিনের আলোয় এই প্রথম দেখলো মিতাকে পার্থ!

এত কাছে এতে স্পষ্ট এর আগে কখনো ওকে দেখবার সুযোগও হয়নি যেমন তেমনি আজকের মত এমন অকপটে চেয়েও বুঝি দেখেনি পার্থ মিতাকে।

আর আজকের মিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পার্থর যেন মনে হচ্ছিল মিতার মুখের মধ্যে কোথায় যেন একটা চেনা স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

ঐ চোখ, ঐ নাক, ঐ ওষ্ঠ, ঐ চিবুক আর চিবুকের নিচে কালো তিলটি বাম দিকে, অস্পষ্ট একটা স্মৃতি যেন।

অন্যমনস্ক পার্থ যেন নিজের চিন্তার মধ্যেই তলিয়ে যায়। একটা হারানো সুর মনের মধ্যে গুণগুণিয়ে ফিরতে থাকে।

চমক্ ভাঙলো পার্থর অনীতার ডাকে, মা তখন থেকে খেতে ডাকছেন, খেতে যাবেন না।

কে! ও অনু—

মা ভাত নিয়ে বসে আছেন।

গঙ্গাস্নান করে কখন ফিরলে তোমরা।

সে তো অনেকক্ষণ!

অনীতা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অনীতার মুখখানি যেন কেমন শুকনো শুকনো মনে হলো।

আজকাল অনীতার সঙ্গে বড় একটা তার কথাবার্তা হয় না। অনীতা যেন তাকে এড়িয়ে এড়িয়েই চলে।

আহারে বসে আবার যেন পার্থ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

হঠাৎ মার কণ্ঠস্বরে পার্থর চমক্ ভাঙে।

ছানার ডালনাটা কেমন হয়েছে রে?

ভাল।

কে রেঁধেছে জানিস?

তুমি বুঝি?

না, অনু। সত্যি মেয়েটার এত গুণ! ও না থাকলে নিচের ওই বুড়ো ভদ্রলোকের

যে কি অবস্থা হতো! তাও ওরা নিচের তলায় ছিল বলে একরকম কেটে যাচ্ছিল, সামনের মাস থেকে যে কি করে কাটাবো তাই ভাবছি।

কেন! ওরা কি এবাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে নাকি?

তাইতো শুনছি! বাইরে মফঃস্বলের স্কুলে নাকি অনু ভাল একটা চাকরি পেয়েছে। সেখানেই কোয়ার্টার দেবে।

পার্থ আর কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে আহার শেষ করে উঠে যায়।

অনুরা তাহ'লে এবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অনেক দিন একত্রে এই বাড়িতে ওরা ছিল। তাছাড়া অনুরা থাকার জন্য মার সম্পর্কে পার্থ অনেকটা বুঝি নিশ্চিন্তও ছিল।

হোটেলের কাজ সেরে ফিরতে অনেক রাত হয়, জানে বাড়িতে অনু আছে কোন চিন্তা নেই। ওরা চলে গেলে কে আসবে না আসবে, তাদের সঙ্গে কি রকম মিল হবে না হবে কে জানে!

বিকেলের দিকে কথায় কথায় পার্থ মৃন্ময়ীকে বলে, কলকাতায় তো আরো কত স্কুল আছে মা, চেষ্টা করলে এখানেই তো ভাল চাকরি পাওয়া যেতে পারে। এখান থেকে যাবার দরকারই বা কি!

আমারও ইচ্ছা নয় পার্থ ওরা যায়। তাছাড়া মেয়েটার উপরে কি যে মায়া পড়ে গিয়েছে!

তাই তো ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে যদি তোর বিয়ে দিতে পারতাম!

এ তুমি কি বলছো মা!

কেন, আমাদের স্বজাত—পালটি ঘর ; তাছাড়া আমার তো মনে হয় অনুর মত হাজারে অমন একটি মেয়ে মেলে না। তা বাছা তুমি যে কি এক অসম্ভব ধনুকভাঙা পণ করে বসে আছো কোথাকার কে, জাত ধর্ম কুল কিছু জানা নেই—

তবু তো বলছি মা তোমাকে, মন্ত্র পড়ে যখন তাকে একবার স্ত্রী বলে স্বীকার করেছি, সেই আমার স্ত্রী।

মৃন্ময়ী আর কিছু বললেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঐ দিনই রাত্রে ফিরবার পর অনীতা এসে দরজা খুলে দিয়ে যখন নিজের ঘরের দিকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে পার্থ তাকে ডাকলো, অনু!

ফিরে দাঁড়ায় অনীতা। বলে, আমাকে কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ। তুমি শুনলাম মফঃস্বলের কোন এক স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছো।

হ্যাঁ।

অনেক বেশী মাইনে বুঝি সেখানে?

খুব বেশী নয় তবে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে।

নাই বা নিলে সে চাকরি অনু!

মৃদু হেসে অনীতা বলে, কিন্তু কেন বলুন তো!

মা তোমাকে কি রকম ভালবাসেন জান তো! মা একেবারে একা পড়ে যাবেন।

বাড়ি তো আর খালি থাকবে না, নতুন কেউ না কেউ আসবেই—

তা হয়তো আসবে, তবু তোমাদের সঙ্গে এতদিনকার জানাশোনা ছিল।

তাদের সঙ্গেও আবার জানাশোনা হবে।

অনীতা কথাটা বলে আর দাঁড়ালো না, নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

সিঁড়ির আলোতে পার্থর মনে হলো শেষের দিকে অনীতার চোখের কোল দুটো যেন চিক্‌চিক্‌ করছিল।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না পার্থ।

সত্যিই কি অনীতার চোখে সে জল দেখেছিল! অন্যমনস্ক পার্থ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যায়। অনীতার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় একই বাড়িতে থাকার দরুন। এবং উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা যে একটা এতদিনে গড়ে ওঠেনি তাও নয়। কিন্তু তার বেশী তো কিছুই নয়।

কোন দিন কোন দুর্বলতাই তো সে আজ পর্যন্ত অনুভব করেনি অনীতার প্রতি।

তবে কি! তবে কি অনীতা তাকে মনে মনে ভালবেসেছে! পরক্ষণেই মনে হয়, না, না এসব পার্থ কি ভাবছে! অনীতার মত শান্ত মিতবাক মেয়ে, সে ভুল করেছে। অনীতা সম্পর্কে সে ভুল করেছে।

কিন্তু ভুলটা তার দিন দুই বাদে মা-ই ভেঙে দিলেন।

বিকেলের দিকে বেরোবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে পার্থ, মৃন্ময়ী এসে ঘরে ঢুকলেন।

কিছু বলছিলে মা?

বলছিলাম অনুকেই তুই বিয়ে কর বাবা।

মা!

হ্যাঁ, এতদিন বলি বলি করেও তোকে বলতে পারিনি। সত্যিই মেয়েটা যে তোকে ভালবাসে রে। অমন বৌ পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমি বলছি এ বিয়েতে তুই সুখী হবি। আজ দুপুর বেলা তুই ঘরে ছিলি না! ওকে তোর ঘরটা গুছিয়ে

দিতে বলেছিলাম, এসে দেখি তোর ঐ ফটোটার সামনে দাঁড়িয়ে অঝোর ঝারে কাঁদছে—

সে রাত্রেও আবার মিত্যা পার্থকে সেই গঙ্গার ধারে বটগাছটির তলায় ধরে নিয়ে এসেছিল।

শ্রাবণ রাত্রির আকাশে মেঘের লুকোচুরি চলেছে।

বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। বাতাসে তারি আর্দ্রতার আভাস তখনো।

তখন থেকেই লক্ষ্য করছি কি যেন আপনি ভাবছেন। কি ভাবছেন এত বলুন তো? মিতা শুধায়।

কি আবার ভাববো!

একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, রাগ করবেন না তো!

রাগ করতে পারি এমন কথা জিজ্ঞাসাই বা করবেন কেন?

একটা গল্প শুনবেন! বলে পার্থ।

গল্প!

হ্যাঁ, নতুন আমি যে বইটায় অভিনয় করবার জন্য কনট্রাক্ট করেছি সেই বইয়েরই গল্প! গল্পের নায়িকার চরিত্রটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আপনাকে তাই শোনাতে চাই আপনার কেমন লাগে?

কিন্তু গল্পের আমি কি বুঝবো?

শুনুনই না আগে—বলে একটু হেসে মিতা বলতে শুরু করে—একটি নয় বছরের মেয়েকে একটি ডাকসাইটে বারবনিতা কুড়িয়ে এনেছিল প্রয়াগের মেলা থেকে একসময়।

চকিতে পার্থ মিতার মুখের দিকে তাকায় চমকে।

মিতা বলে চলে—মেয়েটিকে সেই স্ত্রীলোকটি মানুষ করতে লাগলো মায়ের মতো করে। কিন্তু তখনো সেই মেয়েটি বুঝতে পারেনি যে সেই স্ত্রীলোকটির মনে একটা কু-মতলব আছে!

কু-মতলব!

হ্যাঁ, তারই ব্যবসায় ঐ মেয়েটিকে সে নিযুক্ত করবে মনে মনে ভেবেছিল।

তারপর!

মেয়েটি ঘটনাচক্রে স্ত্রীলোকটির মতলব একদিন অন্তরালে থেকে শুনতে পায়। এবং শুনে সে যেন একেবারে কাঠ হয়ে যায় ভয়ে আতঙ্কে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি

ভীষণ ধূর্ত! মেয়েটির হাবভাব দেখে তার বোধহয় সন্দেহ হয় তাই সে একটা বড় রকমের চাল চালে। মেয়েটিকে বলে সে তার বিয়ে দেবে।

পার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে যেন মিতার গল্প শুনতে থাকে।

মিতা বলে চলে।

মেয়েটা এমন বোকা যে সেই কথায় বিশ্বাস করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এতদিন সে অনিশ্চিতের মধ্যে ভেসে ভেসে চলেছিল, এবার সে স্বামী পাবে, ঘর বাঁধতে পারবে। কিন্তু হায়! তখন তো সে জানতো না যে সুখের স্বপ্ন তার বাতাসেই মিলিয়ে যাবে। বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন রোধ করে মিতা।

অন্যমনস্ক হয়ে সামনের গঙ্গার দিকে তাকায়।

ভাসমান মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। জোয়ার এসেছে বুঝি, ঢেউগুলো এসে পাড়ের উপর ছল ছল ছলাৎ শব্দে ভাঙছে।

তারপর বিয়ে হলো? সহসা একসময় প্রশ্ন করে পার্থ।

অ্যাঁ, বিয়ে! হ্যাঁ হলো বৈকি! টাকার লোভে একজন এলো তাকে বিয়ে করতে। কিন্তু বিয়ের পর বলেছিল আর তাকে সে ছেড়ে যাবে না। কিন্তু সারারাত তারা জেগে থাকবে বলেও কেউ জেগে থাকতে পারলো না। কি ঘুম যে পেয়েছিল—ভোরে ঘুম ভেঙে দেখলো শূন্য শয্যায় সে একা শুয়ে।

এই পর্যন্ত শুনেই পার্থ যেন স্থানকাল সব ভুলে যায়। মিতার একখানি হাত চেপে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, এ—এ গল্প তুমি কোথায়—কোথায় শুনেছো!

কেন বলতো!

বল—বল, কে বলেছে এ গল্প তোমাকে! তুমি—

কি হলো? এ তো একটা বইয়ের গল্প।

কিন্তু ততক্ষণে পার্থ নিজেকে সামলে নিয়েছে। নিজের প্রগলভতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছে।

মিতার হাতখানি কিন্তু তখনো পার্থর হাতের মধ্যে ধরা।

অনেকক্ষণ তারপর দুজনার একজনও কোন কথা বলে না।

পার্থ!

বল।

কেমন লাগলো গল্পটা?

ভাল, কিন্তু শেষটা তো বললে না! তারপর মেয়েটির কি হলো?

মেয়েটির?

হ্যাঁ! স্বামী সম্পর্কে তার কি ধারণা। সত্যিই কি সে ভেবেছিল স্বামী তার কথা রাখেনি? সত্যিই তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল!

তাতো জানি না।

জানো না।

না, সেই স্বামীর সঙ্গে তো তার আর দেখাই হয়নি!

তারপর?

তারপর আর জানি না! গল্পের ঐ পর্যন্তই আমি জানি!

কিছুক্ষণ তারপর আবার দুজনেই স্তব্ধ।

কারো মুখে কোন কথা নেই।

পার্থই তারপর এক সময় বলে, রাত অনেক হলো, উঠবে না।

হ্যাঁ, চলো!

গত কয়েকদিন থেকে যে সন্দেহটা অনুক্ষণ পার্থর মনের মধ্যে পীড়া দিচ্ছিল সেটা নিরবসন হলো না।

মনের কথাটা বলি বলি করেও উত্থাপন করতে পারলো না।

বলতে পারলো না যেন কিছুতেই।

৮

দ্বিপ্রহরে সেদিন একাকিনী ঘরের মধ্যে বসে মৃন্ময়ী মহাভারত পড়ছিলেন। অনীতা স্কুলে গিয়েছে, পার্থও বাড়িতে নেই!

অনীতার ছোট ভাই ও একটা ছেলে সদরের সামনে বসে খেলছিল।

মিতা এসে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

অনীতার ভাই মিতু জিজ্ঞাসা করে, কাকে চান?

পার্থবাবু বাড়িতে আছেন জানো?

না, পার্থদা তো বাড়িতে নেই!

তোমার দিদি, অনীতা দেবী!

দিদি তো এখন স্কুলে!

পার্থবাবুর মা!

তিনি উপরে আছেন। যান না, উপরে সোজা চলে যান!

পূর্বে একদিন মিতা এ বাড়িতে এসেছে। এ বাড়ি তার চেনা।

সোজা মিতা সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল। প্রথম যে ঘরটা সেই ঘরেই বসেই মৃন্ময়ী মহাভারত পড়ছিলেন।

দরজার সামনে জুতোটা খুলে রেখে মিতা এসে ঘরে ঢুকলো।

পদশব্দে মুখ তুলে সামনে মিতাকে দেখে বিস্মিত হয়ে যান মৃন্ময়ী। বিস্ময় তার আরো বেড়ে যায় যখন মিতা এসে তার পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলো।

আহা, থাক্, থাক্—বেঁচে থাকো মা। কিন্তু তোমাকে তো আমি চিনতে পারলাম না মা! কে মা তুমি!

আমি মিনতি! আপনিই বোধহয় পার্থবাবুর মা!

হ্যাঁ! পার্থর কাছে এসেছো বুঝি? কিন্তু সে যে কখন ফিরবে তার তো কিছু ঠিক নেই মা!

কথায় কথায় দুজনার মধ্যে দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে।

এক সময় মিতা বলে, আপনার ছেলের বৌকে দেখছি না মা, সে বুঝি বাড়িতে নেই?

ছেলের বৌ, সে কপাল করে কি এসেছি মা। কোন এক ডাইনীরা কবে নাকি ওর সঙ্গে কোন এক ডাইনীর বিয়ে দিয়েছিল, সেই ডাইনীর পথ চেয়েই আজো ও বসে আছে।

সে কি মা!

সে দুঃখের কথা বলো কেন মা! জানা নেই, শোনা নেই, জাতধম্মো নেই, কার না কার মেয়ে। তুমিই বলতো মা, এমন বিচিত্তির কথা কখনো শুনেছো। পাঁচশ টাকা হাতে গুণে দিয়ে কার না কার সঙ্গে ধরে বিয়ে দিলে। ওকি আবার একটা বিয়ে নাকি!

তা আপনি ছেলেকে আবার বিয়ে করতে বললেও তো পারেন মা।

তাকি বলিনি ভেবেছো। এই তো আমাদের নিচের তলায় আমাদের স্বজাত, পাল্টা ঘর অমন লক্ষ্মীর মত একটি মেয়ে আছে। মেয়েটাও কি কম ভালবাসে নাকি ওকে। তা কে কার কথা শোনে। মরুকগে যাক—কপালে অনেক দুঃখ আছে, আমি তার কি করবো. নইলে এমন লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে!

আমি আজ উঠি মা।

উঠবে? এসো—তা পার্থ এলে কি বলবো?

বলবেন, বলবেন—মিনতি এসেছিল।

গলি পথের মাঝামাঝি আসতেই সহসা অপরিচিত কণ্ঠের সম্বোধনে চমকে ওঠে মিতা!

শুনছেন!

আমাকে বলছেন! কথাটা বলে মুখ তুলে চাইতেই দেখে অনীতা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি!

আপনি আমাকে চেনেন?

স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মিতা রায়কে চেনাটা কি এতই কষ্ট! তারপর একটু থেমে বলে, যদি কিছু মনে না করেন আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

বলুন!

কিন্তু এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সে কথা বলা চলে না, চলুন সামনের পার্কটায় বসিগে।

বেশ তো, চলুন।

মিতার বেশ একটু কৌতুহলই হয়।

কি বলতে চায় অনীতা তাকে!

দুজনে এসে সামনের পার্কে একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে। কিন্তু চুপ করেই থাকে অনীতা।

মিতা বলে, কই কি বলবেন যে বলছিলেন অনীতা দেবী!

আপনি আমার নাম জানেন?

মৃদু হেসে মিতা জবাব দেয়, জানি বৈকি। কিন্তু কি বলবেন বলছিলেন!

পার্থবাবুর সব পরিচয় আপনি জানেন!

কেন বলুন তো!

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি!

তা কিছু কিছু জানি বৈকি।

তা যদি জানেন তো তাকে নিয়ে এ নিষ্ঠুর খেলা খেলছেন কেন?

নিষ্ঠুর খেলা খেলছি!

তা নয় তো কি! আপনাদের সবটাই তো খেলা, সবটাই তো অভিনয়।

আপনার বুঝি এই ধারণা অনীতা দেবী, যে পর্দায় আমরা অভিনয় করি বলে জীবনটাও আমাদের অভিনয়।

তাছাড়া কি! আজ খেয়াল হয়েছে ওকে নিয়ে খেলছেন, আবার দুদিন বাদে শখ যখন মিটে যাবে দূরে সরে যাবেন। প্রচুর পয়সা আছে, প্রচুর অবকাশ, প্রচুর শখ আছে আপনাদের, কিন্তু—

থামুন, থামুন—চেঁচিয়ে ওঠে সহসা মিতা।

না, কেন থামবো, এ নিষ্ঠুর খেলা আপনাকে বন্ধ করতে হবে।

আপনি হয়তো জানেন না যে ওর সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। সহসা এবারে মিতা বলে।

না, কখনোই তা আপনি করতে পারবেন না।

কেন বলুন তো, আপনার আদেশে না আপনার ভয়ে!

তার কোনটাই নয়।

তবে!

দেখুন মিতা দেবী, আমি বলছি এ পথ আপনাদের নয়। যে বাইরের জীবনের সঙ্গে আজ আপনি পরিচিত সে পরিচয় নিয়ে ঘর বাঁধতে যাওয়া আপনার বিড়ম্বনাই হবে। দু'দিনেই হয়ত শখ মিটে যাবে। ঘর হয়ে উঠবে বাঁধন!

আপনি ভুল করছেন অনীতা দেবী! ভালবেসে স্বেচ্ছায় আমি ঘর বাঁধতে চলেছি!

ভালবেসে!

হ্যাঁ—

সত্যি বলছেন, পার্থবাবুকে আপনি ভালবাসেন! এ আপনার দু'দণ্ডের খেয়াল বা চোখের নেশা নয়!

হ্যাঁ। সত্যিই তাকে আমি ভালবাসি।

কয়েকটা মুহূর্ত; এরপর অনীতা নির্বাক থাকে! তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, সত্যিই তাহলে আপনি তাকে বিয়ে করে ঘর বেঁধে সুখী হতে চান!

চাই!

তবে আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুন চিরদিন এমনি করেই তাকে ভালবাসবেন!

আজ যেমন তাকে ভালবাসি, চিরদিনই তেমনি বাসবো।

উঠে দাঁড়ালো অনীতা। মৃদু কণ্ঠে বললে, না জেনে রূঢ় ব্যবহার করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন মিতা দেবী!

নিশ্চয়ই করবো। তবে আপনিও যাবার আগে একটি কথা জেনে যান, অভিনেত্রীও নারী, আপনাদের মত তারাও ভালবাসতে জানে, ভালবাসতে পারে।

অনীতা আর দাঁড়ালো না। ধীর পদে পার্ক থেকে বের হয়ে গেল।

মিতা কিন্তু তারপরও অনেকক্ষণ সেখান থেকে উঠতে পারে না।

সহসা একসময় তার দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায়। আপন মনেই সে বলে ওঠে, ভয় নেই অনু, তোমার এতবড় ভালবাসা মিথ্যে হবে না। পার্থ তোমারই! তুমি তাকে পাবে, নিশ্চয়ই পাবে।

ইতিমধ্যে কখন একসময় সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে, টেরও পায়নি মিতা।

করপোরেশনের লোক মই কাঁধে পার্কে বাতিগুলো একে একে জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

পার্থ ঘরে এসে ঢুকতেই মা মৃন্ময়ী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁরে, মিনতি মেয়েটি কে রে পার্থ!

মিনতি!

হ্যাঁ, সে যে তোর খোঁজে আজ দুপুরে এসেছিল। আহা কি রূপ, যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

চমকে ওঠে পার্থ মার শেষের কথায়। এবং বিদ্যুৎ চমকের মতই একটা সম্ভাবনা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে এবং মনের শেষ সংশয়টুকুর অবসান ঘটিয়ে তাকে পর মুহূর্তেই বিমূঢ় করে দেয়।

সত্যি বলছো মা, মিনতি এসেছিল!

হ্যাঁ, কত কথা বললে, মা বলে ডাকলো।

মা বলে ডাকলো! আর, আর কোন কথা বলেনি মা!

কত কথাই তো বললে, সব কি আর মনে আছে!

আমি আসছি মা!

সেই আবার কোথায় চললি?

পার্থ মার এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল দ্রুত পদে।

সিঁড়িতে অনীতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

পার্থবাবু!

কিন্তু যেন সে আজ শুনেও শোনে না পার্থ। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলে যায়।

হতভম্ব অনীতা পার্থর গমনপথের দিকে চেয়ে সিঁড়ির উপরই দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক।

৯

ফিরে এলো মিতা তার বাড়িতে।

সত্যিই তো সে অভিনেত্রী! সে তো শুধু অভিনয়ই করে। তার ভালবাসাকে লোকে বিশ্বাস করবে কেন!

রূপালী পর্দার বুকে ক্ষণিক সে হাসি-কান্না ভালবাসার মতোই বুঝি তাদের হাসি-কান্না-ভালবাসাটাও শুধু মাত্র অভিনয়।

অভিনয়। অভিনয়। বৈকি! তার চাওয়াটাও অভিনয়, পাওয়াটাও অভিনয়।

সমাজ বহির্ভূত, চিহ্নিত জীব তারা।

অনীতা ঠিকই বলেছে।

হাজার হাজার লালসাদীপ্ত দৃষ্টির কলুষতায় শুধু দেহ কেন, মনও কি তার কলুষিত হয়নি! হাস্যে লাস্যে কটাক্ষে শত শত জনচিত্তকে বিমোহিত করে আসেনি কি সে এই দীর্ঘদিন ধরে।

তবে সাধারণ একজন বারনারীর সঙ্গে তার পার্থক্যটা কোথায়?

সত্যি! সত্যিই নেই তার কোন অধিকার, কোন গৃহস্থ ঘরে বধূ বেশে প্রবেশের। সমাজের কোলে, শুচি স্নিগ্ধ অন্তঃপুরে পা ফেলবার।

অনীতা পার্থকে ভালবাসে।

পার্থকে নিশ্চয়ই সে সুখী করতে পারবে।

অনীতার এত বড় ভালবাসাকে কোন অধিকারে সে অস্বীকার করবে!

কিন্তু এই শহরেও সে আর থাকতে পারবে না।

একটা সুটকেশের মধ্যে তাড়াতাড়ি কিছু কাপড় গুছিয়ে নিয়ে কিছু টাকা সুটকেশের মধ্যে ভরে নিয়ে পার্থের নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে কাঞ্চিকে ডাকলো।

কাঞ্চি আমি বেরুচ্ছি।

কোথায় যাবি!

তা জানিনা! এই চিঠিটা পার্থবাবু এলে তাকে দিবি। অন্য কাউকে চিঠিটা দিস না কিন্তু—।

না, কিন্তু তুই কবে ফিরবি!

জানিনা। আর এই নে চাবি! যতদিন না ফিরি সব দেখাশোনা করবি।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়লো মিতা।

•

মিতা বের হয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক বাদেই পার্থ এসে হাজির হলো হন্তদন্ত হয়ে।

পার্থর সাড়া পেয়ে কাঞ্চি এসে সামনে দাঁড়ালো।

তোমার মাইজীকে একবার ডেকে দেবে কাঞ্চি?

মা তো নেই বাবু—

নেই!

না, দাঁড়ান বাবু। মাইজী আপনার নামে একটা চিঠি রেখে গিয়েছেন।

কাঞ্চি চিঠিটা এনে দিল।

ছোট সংক্ষিপ্ত চিঠি!

পার্থ চললাম, কোথায় যাচ্ছি জানি না! একটা অনুরোধ, অনীতা সত্যিই তোমাকে ভালবাসে, তাকে বিবাহ করো। তোমার বিবাহের সংবাদ পেলে আবার ফিরবো; তার আগে নয়।

ইতি—মিনতি

পাথরের মত চিঠিটা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে পার্থ!

কেন সে এত দেরি করলো!

বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কেন সে মিনতির সামনে এসে দাঁড়ায়নি! কেন বলেনি, আজও তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছি মিনু, চল তুমি আমার ঘরে আমার গৃহলক্ষ্মী!

সারাটা রাত পার্থ কেবল সারা শহরটা ঘুরে ঘুরে বেড়ালো অনির্দিষ্টভাবে।

কোথায় মিনতি কে জানে!

মৃন্ময়ী বলেন, কি হয়েছে তোর পার্থ!

কিছু হয়নি মা!

দিবারাত্র বাইরে বাইরে কোথায় থাকিস!

কেন বিরক্ত করছো মা, আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

লক্ষ্মী বাবা আমার, কি হয়েছে তোর আমাকে বল!

কিছু হয়নি মা, কিছু হয়নি।

দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুবার যাবেই পার্থ মিতার বাড়িতে।

কাঞ্চি তোমার মাইজী ফিরেছে!

নেহিতো বাবুজী!

যে সব বইতে মিতার কনট্রাক্ট ছিল অভিনয় করবার তার প্রডিউসাররা সব মাথায় হাত দিয়ে বসেছে মিতা রায়ের আকস্মিক অন্তর্ধানে।

তারাও চতুর্দিকে মিতার অনুসন্ধান করে ফিরছে।

কিন্তু কোথায় যে মিতা তার গাড়ি নিয়ে ডুব দিল। কোথায় যে আত্মগোপন করলো, কোন সন্ধানই নেই তার।

পার্থ হোটেলে আর যায় না। তাদের লোক প্রত্যহ এসে ঘুরে যায়।

মৃন্ময়ী ছেলের রকম-সকম দেখে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন।

এদিকে যত দিন যেতে থাকে মিতার উপর একটা প্রচণ্ড অভিমান পার্থর বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে গুমরাতে থাকে।

মিতা সব বুঝে, সব জেনেও তাকে কথা বলবার পর্যন্ত অবকাশটুকু দিলে না। এমনি করে তাকে কিছু না জানিয়ে দূরে চলে গেল।

বেশ। তবে তাই হোক, মিতা যদি তাকে ভুলতে পেরে থাকে সেই বা কেন মিতাকে ভুলতে পারবে না।

মিতা যদি এমনি করে দূরে সরে যেতে পারে, সেই বা কেন তার পিছনে পিছনে আর ছুটে বেড়াবে!

তার এই দীর্ঘ নয় বৎসরের প্রতীক্ষার কোন মূল্যই যদি মিতার কাছে না থাকে, সেও চায় না আর মিতাকে। সে অনীতাকেই বিয়ে করবে। অনীতা তাকে ভালবাসে, অনীতাকেই সে গ্রহণ করবে।

অভিনেত্রী কিনা, তাই তার এত বড় নিঃস্বার্থ ভালবাসাকে এমনি নিষ্ঠুরভাবে পায়ে দলে চলে গেল মিতা।

সেদিন সারাটা রাত পার্থ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ফিরতে লাগলো।

ওদিকে নিচের তলায় অনীতারা সব গোছগাছ করছে, পরশু সকালেই তারা এ বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ভোরবেলা, সারাটা রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়ে, রুক্ষ্ম চুল শুষ্ক মুখ পার্থ গিয়ে তার মার ঘরে ঢুকলো, মা!

কি রে?

তোমার কথাই আমি রাখবো মা!

কি?

তোমার মনোনীতা পাত্রী অনীতাকেই আমি বিয়ে করবো।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন মৃন্ময়ী। বলেন—সত্যি, সত্যি বলছিস পার্থ, সত্যিই তুই অনুকে বিয়ে করবি!

হ্যাঁ মা।

দাঁড়া বাবা, নিচে খবরটা দিয়ে আসি!

ছুটে গেলেন মৃন্ময়ী অবিনাশবাবুর ঘরে। এক পাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ অবিনাশবাবু সব তদারক করছিলেন, অনীতা সব গোছগাছ করছিল।

অবিনাশবাবু!

কে! ও আপনি, আসুন—

ও সব বাঁধাছাঁদা এখন বন্ধ করুন। নাতনীর বিয়ের সব জোগাড় করুন।

ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি না করতে পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন অবিনাশ ঘোষাল মৃন্ময়ীর মুখের দিকে।

আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে আছেন কি! আপনার নাতনীটিকে আমি পুত্রবধূ রূপে চাই—

সত্যি, সত্যি—বলছেন?

মিথ্যা কেন বলবো? দেরি আমার সইবে না, এই মাসেরই প্রথম লগ্নে বিয়ে দিতে চাই আমি—

অনীতা সহসা ঐ সময় বাধা দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু মাসীমা—

তুই আবার কথা কইতে আসিস কেন মুখপুড়ি! তুই থাম—

কিন্তু মাসীমা এ যে হবার নয়। পার্থবাবু যে—

কি হবার নয় আর কি হবার সেটা আজ তোর কাছ থেকে আমার জানতে হবে! আমি চললাম অবিনাশবাবু, ঠাকুরমশাইকে দিয়ে দিনক্ষণটা দেখিয়ে আসি।

মৃন্ময়ী বের হয়ে গেলেন।

পাঁচ দিন পরে যে প্রথম রাত্রিতে লগ্ন সেই লগ্নেই বিয়ে দেবেন। একেবারে স্থির করে এলেন।

বিশ্বাস নেই তার ছেলেকে। একবার যখন স্বীকার করেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলাই ভাল। বলা যায় না, ছেলের মতিগতির কথা। ভরসা করেন না তিনি আর ছেলেকে।

আসন্ন উৎসবের যেন সাড়া পড়ে গেল ছোট্ট বাড়িটায়।

কিন্তু অনীতা মনে শান্তি পায় না।

পার্থর সঙ্গে নিরালায় অন্ততঃ একবার তার দেখা হওয়ারও প্রয়োজন। কিন্তু পার্থ যে বাড়িতে কখন আসে কখন যায় তাকে ধরাই যাচ্ছে না।

বিয়ের দুদিন আগে অনীতা জেগে বসে থাকে পার্থের প্রতীক্ষায়, যেমন করে হোক পার্থর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।

রাত বারোটায় পার্থ সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এলো।

কান পেতে ছিল অনীতা। দরজা খুলে দিয়ে পার্থর সামনা সামনি দাঁড়াল অনীতা।

আপনার সঙ্গে আমার দু'টো কথা ছিল।

কি অনু!

এ আপনি কি করলেন!

কেন কি করলাম!

মিতা—

তুমি কতটুকু মিতা সম্পর্কে জেনেছো জানি না অনু, তবে একজন অভিনেত্রীকে আমি বিয়ে করবো শেষ পর্যন্ত একথাটা তুমি ভাবলেই বা কি করে?

এ আপনি কি বলছেন?

ঠিকই বলছি! আজ সব কথা তোমাকে আমি বলতে পারছি না, পরে সবই জানতে পারবে। তবে একটা কথা, মিতা সম্পর্কে জেনো তোমার কোন কিন্তুই থাকার প্রয়োজন নেই!

এখনো সময় আছে, এখনো ভেবে দেখুন—

ভেবেই এ বিয়েতে আমি স্বেচ্ছায় মত দিয়েছি অনু। তবে তোমার দিক থেকে যদি কোন দ্বিধা থাকে বল, এ বিয়ে আমি বন্ধ করে দেবো।

অনীতা কি জবাব দেবে ও কথার।

অশ্রুতে দু'টি চক্ষু তার ঝাপসা হয়ে যায় শুধু।

১০

শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিন এসে গেল।

ছোট বাড়িতে বিয়ে হতে পারে না তাই অবিনাশবাবু গলির মোড়ে একটা বাড়ি কয়দিনের জন্য ভাড়া নিয়েছেন।

নাতনীর বিয়ে তাই আগের দিন থেকেই দরজায় সানাই বসিয়েছেন।

সানাইয়ের শব্দটা গলিপথকে মুখর করে তুলেছে।

রাত সাড়ে আটটায় লগ্ন!

নিজের ঘরে সেজেগুজে পার্থ তার ঘরের মধ্যে বসে আছে। সব যেন কেমন শূন্য ফাঁকা মনে হয় পার্থর। বারবার সেই দুদিনের পরিচিত বিশেষ একখানি মুখই মনে পড়ে পার্থর। কিন্তু না, সে আর ভাববে না। কেন সে ভাববে? এমন সময় মৃন্ময়ী এসে ঘরে ঢুকলেন, কে একটি মেয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে পার্থ!

মেয়ে! চম্‌কে তাকায় পার্থ মায়ের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, কাঞ্চি না কি তার নাম বললো।

কোথায় সে! ব্যগ্র হয়ে উঠে দাঁড়ায় পার্থ।

নিচে।

পার্থ ছুটে তক্ষুনি নিচে নেমে গেল।

একি কাঞ্চি তুই!

বাবুজী শিগ্‌গিরি চলুন একবার আমাদের বাড়িতে।

কেন, কি হলো?

মাইজী আজ দুপুরে হঠাৎ ফিরে এসেছেন।

তার আমি কি করবো!

কিন্তু দুপুর বেলা এখানে ফিরেই সেই যে আপনার বিয়ের খবর শুনে মদ খেতে শুরু করেছেন—

কিন্তু আমার বিয়ের খবর পেল কি করে?

মাইজি ফিরেছে দেখে আমিই এসেছিলাম আপনাকে দুপুরে এখানে খবর দিতে—তারপর আপনার আজ বিয়ে শুনে চলে যাই ফিরে।

কাঞ্চি?

হাঁ, বাবুজি তারপর মাইজি আপনার খবর শুধাতে তাকে সে কথা বলার পর থেকেই ঘরে ঢুকে মদ খেতে শুরু করেছে। বোতলের পর বোতল শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাধা দিতে গিয়েছিলাম, মেরে আমাকে ঘর থেকে বের করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি একটিবার চলুন বাবু, নইলে মাইজী বাঁচবে না। দোহাই আপনার! পায়ে পড়ি।

কাঞ্চিও হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলে।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে পার্থ যেন কি ভাবে, তারপর বলে, চল—

মা পিছন থেকে ডাকল, কোথায় যাস পার্থ!

আসছি মা।

একটু পরেই যে বিয়ের লগ্ন! ওরা যে তোকে নিতে আসবে এখুনি।

বলো তাদের এখুনি ফিরবো।

কাঞ্চিকে সঙ্গে নিয়ে পার্থ বের হয়ে গেল।

বড় রাস্তাতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল।

কাঞ্চিকে সঙ্গে নিয়ে পার্থ সেই ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

ঘরের দরজা বন্ধ!

সোফার উপর বসে মিতা গ্লাসের পর গ্লাস মদ পান করে চলেছে।

পায়ের সামনে গোটাচারেক খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে।

রক্তবর্ণ দুটি চক্ষু, মাথার চুল রুক্ষ্ম পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। শিথিল বাস।

সহসা বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা ও পার্থর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

মিনু, দরজা খোল। মিনু লক্ষ্মীটি দরজা খোল, আমি পার্থ!

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে মিতা কোন সাড়া দেয় না।

হাতের গ্লাসটার বাকী তরল পদার্থটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বোতলটা আবার তুলে নেয়।

ওদিকে দরজায় মুহুর্মুহু করাঘাত।

দরজা খোল মীনু, মীনু—

কাঞ্চি কাঁদতে কাঁদতে বলে, দরজা ভেঙে ফেলুন বাবুজি! ও দরজা খুলবে না।

মীনু, মীনু—

সাড়া নেই তবু মিতার।

অনেক কষ্টে দরজা ভেঙেই শেষ পর্যন্ত পার্থকে ঘরে ঢুকতে হলো।

মীনু—

না, না—তুমি, তুমি যাও—

মীনু, লক্ষ্মীটি শোন, হাতটা ধরার চেষ্টা করে পার্থ মিতার।

মিতা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বোতলটা তুলে নেয় গলায় ঢালবার জন্য।

দুজনে ধস্তাধস্তি চলতে থাকে বোতলটা নিয়ে।

মিতা যেন একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে।

বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে, কেন—কেন এসেছ তুমি! গেট্ আউট—

মীনু—

নো, নো—গেট আউট্—গেট্ আউট!

ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় মিতা পার্থকে।

লজ্জা করছে না একজন অভিনেত্রীর বাড়িতে আসতে—এখনো বের হয়ে যাও বলছি, নইলে দরোয়ান ডেকে বের করে দেবো।

সহসা পার্থ প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল মিতার গালে!

এবং চড়টা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন দপ্ করে নিভে গেল মিতা। সমস্ত মাতলামি তার থেমে গেল হঠাৎ।

তুমি, তুমি আমাকে মারলে!

ঝর ঝর করে দু'চোখ বেয়ে জল পড়ে মিতার।

কোন জবাব দেয় না সে কথার পার্থ। কেবল কাঞ্চির দিকে চেয়ে বলে, এগুলো এঘর থেকে নিয়ে যা কাঞ্চি!

কাঞ্চি বোতলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায় নিঃশব্দে।

মিতা তখন সোফার উপরে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

পার্থ মিতার পাশেই সোফায় বসে পড়ে।

ক্রন্দনরতা অবনতমুখী মিতার মাথায় একখানি হাত রেখে ডাকে, মীনু—

না, না—আমি অভিনেত্রী! আমি অভিনেত্রী—

না, তুমি আমার স্ত্রী!

না, না—তুমি জান না, অনেক পাপ, অনেক ক্লেদ এই শরীরে আমার জমা হয়েছে। তোমার পাশে দাঁড়াবার কোন যোগ্যতাই যে আজ আর আমার নেই!

নিশ্চয়ই আছে। তোল, মুখ তোল! চাও আমার দিকে।

না, না—

মীনু—

মুখ তোলে মিতা। জলে ভেজা দুটি চক্ষু!

দোষ তো শুধু একা তোমারই নয় মীনু, আমারও যে আছে!

তোমার দোষ!

নিশ্চয়ই। সে রাতে যদি ঘুমিয়ে না পড়তাম—

তুমি, তুমি তাহলে আমাকে কোন দিন ঘৃণা করবে না!

কেন ঘৃণা করবো!

সত্যি বলছো?

সত্যি!

ওদিকে রাতের প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে চলে। এককোণে জ্বলে তখনো সোহাগ প্রদীপ।

সানাই বাজছে তখনো।

চিত্তির করা পিঁড়ির উপর বসে অনীতা। লাজবস্ত্রে ঢাকা মুখখানি।

সর্বাঙ্গে লাল বেনারসী, কপালে চন্দন-তিলক।

অনীতার দু-চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসছে।

কিন্তু কেমন করে সে ঘুমাবে! এ রাত কি ঘুমাবার!

এ রাত যে শুধুই জেগে থাকার।